Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Sadia Akter

রোলঃ 21500766

৬ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Sadia Akter

রোলঃ 21500766

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Sadia Akter, আইডিঃ 21500766 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Sadia Akter

আইডিঃ 21500766

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভুমিকা:	৫
পারিবারিক বন্ধন কী?	৬
ইসলামিক দৃষ্টিতে পারিবারিক বন্ধন কী?	৬
পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :	৮
বর্তমান পারিবারিক বন্ধন, অনুশাসন,ভবিষ্যত প্রজন্ম:	১৪
পারিবারিক বন্ধনের ভাঙনের ফলে নেতিবাচক প্রভাব:	১৮
পারিবারিক কাঠামো শক্ত হোক সুন্দরভাবে বিকশিত হোক পারিবারিক বন্ধনের ফলে:	১৯
সুস্থ বিকাশের জন্য চাই পারিবারিক বন্ধন:	২৪
সন্তান পালনে পারিবারিক বন্ধন কেন জরুরি:	২৮
সুষ্ঠ সমাজ গঠনে কেন গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বন্ধন?	২৯
আমাদের জীবনে পরিবারের ও বন্ধনের গুরুত্ব:	৩১
আলগা হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন:	৩২
সন্তানদের সঙ্গে মা-বাবার সম্পর্ক	৩৩
পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করার প্রাথমিক ধাপ:	৪০
পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে ইসলামের নির্দেশনা:	৪১
পারস্পরিক সম্পর্কের লালন ও বিকাশে পারিবারিক বন্ধন:	৪২
ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক বন্ধন, পারিবারিক বন্ধন দৃরভাবে গঠনের কৌশল:	৪৮
সারসংক্ষেপ :	৫৭

ভুমিকা:

কুরআনের ভাষা অনুযায়ী ,একজন মুসলমানের উপর শুধুমাত্র তার নিজের আমল,আখলাক সংশোধনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি বরং নিজের ইসলাহের সাথে সাথে নিজ পরিবার,নিজের সন্তান, নিজের আত্মীয় স্বজন ও নিজে গোত্রের লোকদের ইসলাহে(সংশোধনের)প্রচেষ্টার সব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব ও তাকে দেয়া হয়েছে।

পরিবারের সদস্যরা যখন আল্লাহর দেওয়া দায়িত্বানুভূতি সম্পর্কে সজাগ থাকবে, স্ত্রী তার অধিকার পূর্ণাঙ্গভাবে লাভ করবে। স্বামী যখন স্ত্রীর কাছে তার অধিকার পাবে, সন্তান বাবা-মায়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও তাদের অধিকার লাভ করবে, আত্মীয়-স্বজন যখন পরস্পরের যথাযথ সম্মান-মর্যাদা পাবে, তখন কোনো স্ত্রীর আর অসন্তোষ থাকবে না। কোনো স্বামী ভালোবাসা ও সুন্দর জীবনযাপনে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হবে না, কোনো সন্তানই বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করবে না এবং আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কের দৃঢ়তায় আলল্লাহর রহমত, বরকত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকবে।

শুধু তাই নয়, ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক জীবন হলো আল্লাহর মহাঅনুগ্রহ। মানুষ আলল্লাহ প্রদত্ত পারিবারিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হলে সমাজ থেকে নানা ধরনের অপরাধপ্রবণতা এবং জীবনের শেষ সময়ে বৃদ্ধাশ্রমের মতো দুঃখী জীবনযাপন চিরতরে নির্মূল হবে। তাই একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠনের লক্ষ্যে আল্লাহর ও রাসুলের (সা.) নির্দেশনাগুলো মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের ইমানের অপরিহার্য দাবি।

পারিবারিক বন্ধন কী?

পারিবারিক বন্ধন: সাধারণ অর্থে একটি পারিবারিক সম্পর্ক ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে একেবারে বন্ধন পরিবারের সদস্যদের একটি শক্তিশালী সংযোগের ফ্যামিলিয়াল শব্দের ল্যাটিন রোড ফ্যামিলিয়ার অর্থ পরিবার সনাক্ত করা সহজ ঘটনা বা সম্পর্ক বা পরিবারের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্তজিনিসকে বর্ণনা করে।

ইসলামিক দৃষ্টিতে পারিবারিক বন্ধন কী?

আল্লাহ পাকের হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মহানবী(স)এর চেয়ে আর কে যত্ন হতে পারে।নবুয়ত প্রাপ্তির পর তাঁর উপর সর্বপ্রথম যে হুকুম নাজিল হয়েছিল তা ছিল এই যে :

وأنذر عشيرتك الأقربين

(অর্থ:এবং আপনি নিজ গোত্রের নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করুন । যার ফলে মহানবী সাঃ আল্লাহ পাকের এ হুকুমের ওপর আমল করার জন্য নিজ গোত্রের নিকট আত্মীয়দেরকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে একত্রিত করলেন এবং খানা খাওয়া শেষে বললে,

يافاطمة بنت محمد يا صفات ابنة عبت الطب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني ما شئتم بني عبد المطلب والله ما أعلم شابا من العرب.جاء قومه بأفضل جئتكم به؟ إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة و قدام ني الله أن أدعوكم إليه فأيكم ي و از رني على هذا الأمر على أن يكون اجنبي

অর্থ হে ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ! হে সুফিয়াত বিনতে আব্দুল মুতালিব! হে আব্দুল মোতালেবের সন্তানেরা ! আমার আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তোমাদের মুক্তি সম্পর্কে কোন ইখতিয়ার (ক্ষমতা নেই)তোমরা আমার মাল হতে যতটুকু ইচ্ছা আমার নিকট খেয়ে নাও। হে আব্দুল মোতালেব এর সন্তানেরা! আল্লাহর কসম, যে জিনিস আমি তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছি আমার আরবের এমন কোন যুবক সম্পর্কে জানা নেই জিনিসপত্র লোকদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন জিনিস নিয়ে এসেছে ।আমি তোমাদের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিয়ে এসেছি এবং আল্লাহ পাক আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহবান করি তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে এ কাজে আমার হাতকে মজবুত করবে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার ভাই রূপে গণ্য হবে ।

(তাফসীরে ইবনে কাসির ৩ :৩৫০-৩৫১ পৃষ্ঠা)

কেবলমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু সালামের ওপর নয় বরং সকল নবী তরিক তরিকায় ছিল যে তারা তাদের পরিবার থেকে তাবলীগের কাজ আরম্ভ করেছেন এবং নিচে আল্লাহ পাকের বিধানের ওপর আমল করার সাথে সাথে নিজ পরিবার লোকদের দ্বীনি শিক্ষা দীক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার চালিয়েছেন এবং তৃতীয় দৃষ্টি রেখেছেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম একত্রিত করে যে ওসিহত করেছিলেন পবিত্র কুরআনে তার আলোচনা এভাবে করা হয়েছে।

اذقا ل لبنيه ما تعبر ون من بعدى قا لو ا نعبد الهك واله ابا ءك ابر اهيم و ا سما عيل وإسحاق الها وا حد ا و نحن له مسلمون.

অর্থ :যখন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার ইবাদত করবে তারা বলল আমরা ওই পবিত্র সরকার ইবাদত করব যার ইবাদত আপনি এবং আপনার বাপ দাদা ইব্রাহিম ইসমাইল ও ইসহাক করেছেন অর্থাৎ সেই মাবুতের যিনি একক এবং অদ্বিতীয় এবং তার অনুগত্যের ওপর আমরা কায়েম থাকব হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম দোয়া এভাবে কুরআনে বর্ণিত।

.رب اجعلنا مقيم الصلو ة ومن ذرتى ربنا وا تقبل دعا ء

অর্থ হে আমার প্রতিপালক আমার দোয়া কবুল করুন।

আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এর এমন দুটি বা একটি নয় অনেক দোয়ায় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যার দ্বারা জানা যায় যে এই সন্তান এবং নিজ পরিবারের লোকদের দ্বীনি শিক্ষা দীক্ষার পিকে তাদের শিরায় শিরায় ভরা ছিল আলোটা পবিত্র কুরআনে যেখানে মুসলমানদেরকে নিজেদের খোদাই আজাব থেকে বাঁচতে বলেছেন সেখানেই নিজ পরিবারবর্গ কেউ খুদাইয়ে আজাব থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব তাদের ওপর ওপর করেছেন যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে

.يا ا يها الذ ين ا منو اقو ا ا تفسكم و ا هلكم نا را

অর্থ সেই ঈমানদারগণ নিজের জান ও নিজের পরিবার বর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

"একমাত্র শিলা যা আমি জানি যে স্থির থাকে, একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা আমি জানি তা হল পরিবার।" – লি ইয়াকোকা। কী একটি পরিবারকে শক্তিশালী করে এবং কীভাবে পারিবারিক বন্ধন তৈরি করা যায়? পরিবারের সদস্যরা একে অপরের জন্য যে সমর্থন এবং স্নেহ প্রদান করে তার উপর একটি সফল পরিবার তৈরি হয়। একটি পরিবার জানে কিভাবে প্রতিটি সদস্যের পার্থক্যকে আলিঙ্গন করতে হয় এবং তাদের স্বতন্ত্রতাকে লালন করতে হয়। যাইহোক, একটি দৃঢ় বন্ধনের জন্য প্রয়োজন যে আপনি একে অপরকে বুঝতে এবং গ্রহণ করেন, প্রয়োজনে তাদের জন্য উপস্থিত হন এবং একসাথে মানসম্পন্ন সময় কাটান। আপনার পিতা-মাতা এবং ভাইবোনরা সর্বদা আপনার জন্য থাকবেন তা জানা এবং বিশ্বাস করা আপনাকে আরও কাছে টানে। যাইহোক, দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা আমাদের একসাথে থাকতে দেয় না। অন্যান্য সকল সম্পর্কের মতো, পারিবারিক সম্পর্কের জন্য প্রচুর আপস এবং ক্রমাগত লালন-পালনের প্রয়োজন হয়,

যা শুধুমাত্র পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। এটি আপনাকে একে অপরকে আরও ভালভাবে বুঝতে এবং আপনার পারস্পরিক মঙ্গল বাড়াতে দেয়। পারিবারিক বন্ধনের সময় এবং এর প্রাণশক্তি সম্পর্কে আরও জানতে আমাদের পোস্ট পড়া চালিয়ে যান। এছাড়াও আমরা পারিবারিক সময় এবং ভালোভাবে বন্ধনের কৌশলগুলির সুবিধাগুলি ভাগ করি।

পারিবারিক বন্ধনের জন্য দরকার ফ্যামিলি বন্ডিং টাইম। আর ফ্যামিলি বন্ডিং টাইম হল কোয়ালিটি টাইম যেটা আপনি আপনার পরিবারের সাথে কাটান, আপনার পছন্দের জিনিসগুলি করেন। এতে একসাথে কাজ করা, পিকনিকে যাওয়া, একসাথে সিনেমা দেখা, একসাথে খাবার খাওয়া, একে অপরকে সাহায্য করা, একটি গেম খেলা এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এটি একটি পরিবারের সদস্যদের একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে, একে অপরকে জানতে এবং বুঝতে, একতা অনুভব করতে এবং একটি শক্তিশালী বন্ধন গড়ে তুলতে দেয়।

সম্পর্কিত: আপনার পরিবারের সাথে 12টি মজার উইকএন্ড ক্রিয়াকলাপ

পারিবারিক বন্ধন সময়ের 10টি সুবিধা

"যে বন্ধনটি আপনার প্রকৃত পরিবারকে সংযুক্ত করে তা রক্তের নয়, একে অপরের জীবনে সম্মান এবং আনন্দের।" –রিচার্ড বাচ গুণগত মানসম্পন্ন পারিবারিক সময় একসাথে কাটালে নিম্নলিখিত উপায়ে পিতামাতা এবং সন্তান

উভয়েরই উপকার হয় ।

1. শিশুদের একাডেমিক সাফল্যের ওপর প্রভাব:

গবেষণায় দেখা গেছে পিতামাতার সম্পৃক্ততা শিশুদের শিক্ষাগত এবং সাহিত্যিক ফলাফলের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে (1) (2) । একসাথে সময় কাটানো , তাদের স্কুলের কার্যকলাপে গভীর আগ্রহ দেখানো, একসাথে হোমওয়ার্ক করা ইত্যাদি আপনার বাচ্চাদের একাডেমিক সাফল্যের উপর বিশাল প্রভাব ফেলতে পারে।

2. সামাজিক দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে

পারিবারিক বন্ধন সামাজিক দক্ষতা বাড়ায়। পরিবারের সাথে বন্ধন শিশুদের অপরিহার্য সামাজিক দক্ষতা শিখতে সাহায্য করে। এটা তাদের শেখায় কিভাবে তাদের বাবা-মাকে দেখে সামাজিক সেটিংসে আচরণ করতে হয়। এটি পিতামাতাদের একে অপরের সাথে আরও ভাল যোগাযোগ করতে এবং তাদের সন্তানদের জন্য উদাহরণ স্থাপন করার অনুমতি দেয়।

3. অর্থপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করে

পারিবারিক বন্ধনের সময় বাচ্চাদের পরিবারের বাইরের লোকেদের সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে - সেটা তাদের শিক্ষক, সহকর্মী বা বড়রা হোক। আপনি কীভাবে পরিবারে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করেন বা যোগাযোগ করেন তা প্রতিফলিত করে যে আপনার সন্তানরা পরিবারের নিকটবর্তী পরিবারের বাইরের লোকেদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করে।

একটি সুখী, ঘনিষ্ঠ পরিবার বাচ্চাদের পরিবার এবং সম্পর্কের গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করে। তারা পিতামাতা-সন্তানের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের সন্তানদের জন্য আরও ভাল পিতামাতা হওয়ার চেষ্টা করে (16)।

4. যোগাযোগ উন্নত করে

এটি যোগাযোগ উন্নত করতে সাহায্য করে। একসাথে মানসম্পন্ন সময় কাটানো আপনাকে একে অপরকে আরও ভালভাবে বুঝতে, আপনার অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে এবং বিভিন্ন মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানাতে সক্ষম করে (3)। এটি বাচ্চাদের বাবা-মায়ের সাথে খোলামেলাভাবে কথা বলতে এবং আলোচনা করতে উৎসাহিত করতে সহায়তা করে। এটি শিশুদের সক্রিয় শ্রোতা হতে সাহায্য করে।

5. একতা বৃদ্ধি করে

পারিবারিক সময় মানে এমন একটি সময় যখন পরিবারগুলো একত্রিত হয়। একটি পরিবার যে একসাথে সময় কাটায় তারা একে অপরের পছন্দ-অপছন্দ বুঝতে পারে এবং এমন কিছু করে যা একে অপরকে বাড়াতে সাহায্য করে। তারা একে অপরের সাথে সহানুভূতিশীল এবং সহযোগিতা করতে এবং সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতে শেখে। এটি আপনার বাচ্চাদের তাদের সমস্যাগুলি নিয়ে আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্য নির্দ্বিধায় অনুমতি দেয়।

অ্যাশলে, ছয় সন্তানের মা, তিনি কীভাবে তার পরিবারের সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটান তা ভাগ করে নেন। তিনি বলেন, "আমাদের পারিবারিক ইউনিটের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা অবশ্যই দ্বন্দ্ব কমায় এবং আমার বাচ্চাদের আত্মীয়তার অনুভূতি দেয় (i)।"

6. দ্বন্দ্ব সমাধান করতে সাহায্য করে

পরিবারের মধ্যে সময়ে সময়ে দেখা দিতে পারে এমন দ্বন্দ্বগুলি সমাধান করা সহজ হয়ে যায় যখন আপনি পরিবারের জন্য সময় পান। একটি শক্তিশালী পরিবার যা একসাথে মানসম্পন্ন সময় কাটায় একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে এবং পার্থক্যের সাথে মিলিত হতে পারে এবং একে অপরকে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। এটি পরিবারের বাইরের দ্বন্দ্বগুলিও সমাধান করতে সহায়তা করে। সময় ব্যয় করা এমন বিষয় নিয়ে আলোচনার দিকে পরিচালিত করবে যা পরিবারের একজন সদস্যকে কষ্ট দেয় এবং আবেগের জন্য নিরাপদ স্থান প্রদান করে।

7. আচরণ উন্নত করে

বাবা-মায়ের বাচ্চারা যারা প্রায়শই একসাথে ভাল সময় কাটায় তাদের মানসিক এবং আচরণগত ব্যাধি প্রদর্শনের সম্ভাবনা কম থাকে (4) । এছাড়াও, পারিবারিক বন্ধনের সময় আপনাকে একে অপরকে মূল্য দিতে এবং ঘনিষ্ঠতা এবং বিশ্বাস তৈরি করতে সহায়তা করে।

নির্বিচারে আত্ম-প্রকাশ করা সহজ হয়ে ওঠে যখন পরিবারের চারপাশে বিচার হওয়ার ভয় থাকে না। এটি একজনকে তাদের সত্যিকারের সাথে সংযোগ করতে এবং স্বাধীনতার অনুভূতি অনুভব করতে সহায়তা করে (15)।

8. আত্মসম্মান উন্নত করে

পারিবারিক বন্ধনের সময় শিশুদের আত্মমর্যাদা গড়ে তুলতে সাহায্য করে । গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে দরিদ্র শিশু-পিতা-মাতার বন্ধন শিশুদের মধ্যে কম আত্মসম্মানবোধের দিকে নিয়ে যায় এবং মানসিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে (5) । পরিবারের সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটানো শিশুদের ভালবাসা এবং গ্রহণযোগ্য বোধ করতে সাহায্য করে এবং তাদের স্ব-মূল্যের প্রশংসা করতে সক্ষম করে।

9. পুনরায় সংযোগ করতে সাহায্য করে

পারিবারিক সময় আপনাকে আপনার সন্তানদের সাথে পুনরায় সংযোগ করতে সহায়তা করে। এটি বিশেষভাবে সত্য যদি আপনি দুজনেই কর্মজীবী পিতামাতা হন এবং সপ্তাহের দিনগুলিতে আপনার সন্তানদের জন্য খুব কম সময় পান। দিনের নির্ধারিত সময়ে বা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে একসাথে মজাদার ক্রিয়াকলাপ করা আপনার বাচ্চাদের আপনার কাছে খোলামেলা করতে এবং তাদের জীবন সম্পর্কে আরও তথ্য ভাগ করতে সহায়তা করতে পারে।

10. পারস্পরিক শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করে

একটি পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিজেদের প্রকাশ করতে পারে, একে অপরের স্বতন্ত্রতাকে মূল্য দিতে পারে, কথোপকথনে নিযুক্ত হতে পারে এবং পারিবারিক বন্ধন ইভেন্টের সময় তাদের জীবন সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে। ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত হওয়া এবং একে অপরের ভূমিকা এবং সীমানা বোঝা পারস্পরিক সম্মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে।

তথ্যসূত্র:(বন্ধন গড়ে তোলার পথে নেতৃত্ব দিন)

শ্রেষ্ঠ ধর , এমএ, এম.ফিল দ্বারা পর্যালোচনা করেছেন

লিখেছেন শিখা ঠাকুর , এমবিএ

সিদ্ধার্থ কেসিরাজু , এমএ, সার্টিফিকেশন ইন রিলেশনশিপ কোচিং দ্বারা সম্পাদিত

বেনিদামিকা জে লাতাম , এমএ, এমএসসি দ্বারা সত্য-পরীক্ষা করা হয়েছে • 14 নভেম্বর, 2023

আমরা বড় হওয়ার সাথে সাথে আমাদের অগ্রাধিকার পরিবর্তিত হয় এবং মানুষের সাথে আমাদের বন্ধনও পরিবর্তিত হয়। আমেরিকানরা তাদের বয়সের উপর ভিত্তি করে তাদের বেশিরভাগ সময় কাটায়। আমেরিকান টাইম ইউজ সার্ভে এবং লিন্ডবার্গ দ্বারা সংগৃহীত তথ্য অনুসারে, কিশোররা তাদের বেশিরভাগ সময় পরিবারের সাথে এবং সবচেয়ে কম সময় একা কাটায়। কিন্তু এটি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয় কারণ পরিবারের সাথে কাটানো সময় ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং বছরের পর বছর নির্জন সময় বেড়ে যায়। একজন সঙ্গীর সাথে কাটানো সময়ও যুবকদের তুলনায় বার্ধক্যের বৃদ্ধি দেখতে পায় যখন লোকেরা কাজ এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতি নিয়ে ব্যস্ত ।

বর্তমান পারিবারিক বন্ধন, অনুশাসন,ভবিষ্যত প্রজন্ম:

পরিবার হচ্ছে মানব সভ্যতার আদি সংগঠন। পরিবার থেকেই গড়ে উঠে সমাজ। সুন্দর ও সুস্থ সমাজের জন্য আদর্শ পরিবার অপরিহার্য। পারিবারিক বন্ধন আমাদের গর্ব। প্রজন্মের পর প্রজন্ম পারিবারিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুশিক্ষার যে শক্ত ভিত দাঁড় করিয়েছে তার উপরই আমাদের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পরিবারের মঙ্গলের জন্য পুরোজীব নিবেদিত করেছিলেন আমাদের মা-বাবা, তাদের মা-বাবা এবং তার পূর্ববর্তী বংশধরও। সময়ের পরিক্রমায় এই বন্ধন আজ হুমকির সম্মুখীন। বিশ্বায়ন ও নগরায়নের ফলে দিন দিন দুর্বল হচ্ছে স্থিতিশীল সমাজ গঠনের নিয়ামক এই পারিবারিক বন্ধন। ভেঙ্গে যাচ্ছে পরিবারের আদর্শ, মূল্যবোধ, আর স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধন। বাংলাদেশে এক সময়ে পারিবারিক বন্ধন ও পরিবারের সদস্যদের পরস্পর স্নেহ-মমতার যে দৃঢ়তা ছিল, তা যেন আজ ম্রিয়মান। যার কারণে পারিবারিক মূল্যবোধ তথা ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে। পারিবারিক বন্ধনের শীতলতা ব্যক্তিজীবনে অস্থিরতার মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে বহুগুণে।

আমরা অনেক সময় বাবা-মায়ের ভালোবাসা আর শাসনের বাইরে গিয়ে যে স্বাধীনতার কথা বলি, তা হচ্ছে সন্তানকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেয়া। পারিবারিক অনুশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন সন্তান নেশাগ্রস্ত কিংবা যে কোন খারাপ অভ্যাসে আসক্ত হয়ে বিপথগামী হয়। একজন মানব সন্তান পারিবারিক শিক্ষা ব্যতীত কখনো আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। মানবজাতির বিকাশ, সভ্যতার সৃষ্টি, সংস্কৃতিবোধের উন্মেষ সবকিছুর মূলে আমাদের পারিবারিক সুশিক্ষা আর দৃঢ় বন্ধন। যে জাতির পারিবারিক বন্ধন যত দৃঢ়, সে জাতি তত সুশৃঙ্খল ও উন্নত মানসিকতার।

পাশ্চাত্যের দেশে দেশে আজ পারিবারিক বন্ধন ভেঙে পড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশেও দেখা যাচ্ছে, অনেক উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে জঙ্গীবাদের মতো ভয়ানক রাস্তায় ধাবিত হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, তাদের পারিবারিক বন্ধন নেই, যে যার মতো চলাফেরা বা জীবন অতিবাহিত করে। কেই কাউকে পরোয়া করে না। যৌথ পরিবারগুলোতে দেখা যায় দাদা-দাদী, চাচা-চাচী কিংবা

মা-বাবার সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে থাকার কারণে সন্তানের ভালো-মন্দ তদারকি করতে পারেন এবং সন্তানের মনেও কোন খারাপ বাসনা সহজে বাসা বাঁধতে পারে না। পারিবারিক বন্ধনের সাথে সাথে একজন ব্যক্তির সাথে সমাজের বন্ধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক বন্ধন যতই দুর্বল হয়, সমাজে ততই বিশৃংখলা বা অশান্তি বাড়তে থাকে। ব্যক্তির সাথে সমাজের বন্ধন যত দৃঢ় থাকবে সামাজিক অনাচার তত কম হবে। সামাজিক বন্ধন যুগ যুগ ধরে আমাদেরকে সুন্দরের পথে প্রেরণা যুগিয়েছে এবং অসুন্দরের পথ থেকে নিরুৎসাহিত করেছে। সামাজিক এই বন্ধনের শিক্ষা কিন্তু পরিবার থেকেই পেয়ে থাকি। সামাজিক বৈষম্য, ব্যবিচার, মাদকাসক্তি, জঙ্গীবাদসহ সকল প্রকার অপরাধমূলক কর্মকা- থেকে মুক্তি পেতে হলে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতে হবে। বন্ধন দৃঢ় হলে জবাবদিহিতা চলে আসে। যেখানে জবাবদিহিতা থাকে সেখানে অপরাধ প্রবণতা কম থাকে। সামাজিক সম্পর্কহীন বা কম সম্পর্কযুক্ত মানুষ বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগ বা বিষন্নতায় আক্রান্ত হয়। তাই, নিজেকে ভালো রাখার তাগিদেই আমাদের উচিত পরিবার তথা সমাজ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করা। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্ক অনেকটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। একটা সময় ছিল শিশুরা যৌথ পারিবারিক পরিবেশে দাদা-দাদী, চাচা-চাচী ও চাচাত ভাই-বোনের মাঝে বড় হতো। এখন তা একেবারেই কমে গেছে। প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ও অপব্যবহারের ফলে শিশুরাও এখন খেলছে মোবাইলসহ নানান রকম ডিভাইসের সাথে। পরিবারের ভেতরে একই ঘরে বসবাস করেও যেন সকলে আলাদা। যে যার মতো ব্যস্ত মোবাইলে। বর্তমান প্রজন্ম শিশুকাল থেকেই পরিচিত হয়ে উঠছে নানা ধরনের প্রযুক্তির সাথে এবং একসময় তারা তাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে মোবাইল, ট্যাব, কম্পিউটার, ল্যাপটপসহ নানা ধরনের যন্ত্রের সহজলভ্যতা এবং অপব্যবহারের ফলে নতুন প্রজন্ম পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে তেমন মিশতে পছন্দ করে না। একঘেঁয়েমির এক রোবোটিক জীবনযাপনে অভ্যস্থ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। অথচ পারিবারিক বন্ধন আর

শিক্ষা থেকেই সামাজিক বন্ধন, সহমর্মীতা, ন্যায়নিষ্ঠা, আদব-কায়দা, জবাবদিহিতার শিক্ষা পাওয়া যায়।

বর্তমানে বিভিন্ন কারণে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে ক্ষুদ্র পরিবার বা একক পরিবারে রূপান্তরিক হচ্ছে। ক্ষুদ্র বা একক পরিবারের সন্তানরা ক্ষুদ্র জগতের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে। পরিবার বিমুখিতা তাদেরকে ঠেলে দিচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে এবং ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে চিরায়িত সামাজিক বন্ধনও। জীবন-জীবিকার তাগিদে তরুণ-তরুণীরা পরিবার তথা দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। জীবনের দীর্ঘসময় বিদেশে থাকার কারণে পরিবারের সাথে তাদের দূরত্ব বাড়ছে। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হলেও পারিবারিক মূল্যবোধের বিষয়গুলো থেকে যাচ্ছে তাদের অজানা। অথচ পারিবারিক বন্ধন আমাদের মাঝে স্থিতিশীলতার বোধ এবং আত্মিক প্রশান্তি আনয়ন করে। পারিবারিক সম্পর্ক মানুষকে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় দেয় এবং নতুন প্রজন্মকে নিরাপদ রাখতে কার্যকর সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দৃঢ় পারিবরিক সম্পর্ক ও অনুশাসন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঠিক বিকাশ, সুখ এবং সাফল্যের পথ নির্দেশক। বর্তমান বিশ্ব সহিংসতা, ক্রোধ আর উদাসীনতায় পরিপূর্ণ। অপরদিকে, উন্মুক্ত সংস্কৃতির বদৌলতে আজ দেশি-বিদেশী বিভিন্ন চ্যানেল ও মিডিয়াতে নাটক বা সিনেমাগুলোতে পারিবারিক বন্ধন বা মূল্যবোধের বিষয়ের চাইতে পারিবারিক কলহের বিষয়গুলোই দেখানো হয় বেশি, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আমাদের পরিবার ও সমাজ তথা নতুন প্রজন্মের মন-মগজে। তাই আমাদের সকলের উচিত পারিবারিক শান্তি ও সম্প্রীতির মূল্যবোধকে ফিরিয়ে এনে নতুন প্রজন্মের সাথে পরিবার ও সমাজের বন্ধনকে আরো দৃঢ় ও মজবুত করা। একটি সুস্থ, আদর্শিক এবং নৈতিকবোধ সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন ও অনুশাসনের বিকল্প নেই।

পারিবারিক বন্ধন রাখার জন্য পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা :পরিবার ই একমাত্র কেন্দ্র স্থল যেখানে মায়া মমতা স্নেহ ভালোবাসা সহানুভূতি দিয়ে করা যায় পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার জন্য। পরিবারের সদস্যদের যে সকল ভূমিকা পালন করতে হবে তা হল :

1।পরিবার প্রতিটি সদস্যের পরস্পরের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থাকতে হবে একের প্রতি অন্যের বিশ্বাস শ্রদ্ধা সম্মান সমান বোধ থাকতে হবে ।

2।পরিবারের সদস্য নিজেদের সুখ-দুঃখ এবং কাজগুলো সবার মধ্যে ভাগ করে নেয়া হয় ,ফলে প্রতি সদস্য প্রতি সম্মান বাড়ে ও পারিবারিক বন্ধন বৃদ্ধি পায়। পরিবারে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা বাবা-মা ও সন্তানের কর্তব্য। 3।বাবা মা ছেলে মেয়েদের কে সাথে সব সময় বন্ধুর মতন আচরণ করবে মেলামেশা করবে তাদের সব সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত এতে ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ সুযোগ পায় এবং পিতামাতার সাথে জড়িয়ে পড়ে না বিশৃঙ্খলাতে ।আর এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক শিশুই স্বতন্ত্র তাদের সতর্কতা অনুযায়ী তাদেরকে বুঝতে হবে শিশুদের কে জন্য মনস্তাত্ত্বিক চাহিদারও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এসব মনস্তাতির চাহিদার মধ্যে রয়েছে ইংরেজি অক্ষরের এ-

এ=এফেকশন

এ = একসেপট

এ=এচিভমেন্ট

4। পারিবারিক বন্ধন টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবারের পরিবারের বড়দের নয় ছোটদেরও দায়িত্ব থাকে পরিবার সদস্যদের উদারতাই পারি চাবিকাঠি,

5।পরিবারের সদস্যদের স্বার্থপরতা আত্ম সংসারে অশান্তি ডেকে আনে অর্থনৈতিক সংকট আমাদের পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে বড় অন্তরায় পরিবার প্রতিটি সদস্য যদি তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে পারিবারিক আন্তর্জাতিক সংকট তৈরি হয় না পরিবার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায় ।

6।পরিবার যে কোন সদস্য কোন খারাপ ভাবে পরিচালিত হলে ভালো ভাষার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে হবে ।

7।পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে বিশ্বাসযোগ্য সহযোগিতামূলক সম্পর্ক করা ।

8।পারিবারিক সদস্যদের মধ্যকার আস্থা ও বিশ্বাস উপরে পরিবারের শান্তি বজায় রাখে, সুস্থ গতিশীল পারিবারিক জীবন দান করে।

9। পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের বিপদে সহযোগিতা-সাহায্য করতে হবে এর ফলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আশাহত হবেনা।

পারিবারিক বন্ধনের ভাঙনের ফলে নেতিবাচক প্রভাব:

পারিবারিক বন্ধনের ভাঙ্গানোর ফলে পরিবারের বড় থেকে ছোট প্রত্যেক সদস্যদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।

1।পরিবারের ছোট সদস্যরা বা সন্তানেরা মা-বাবার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে

2। সন্তানেরা বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

3। সন্তানেরা মাদকাসক্ত হতে পরিবারের বন্ধন ভাঙনের ফলে ।

4।বয়স্কদের উপর বেশি শারীরিক ও মানসিক সমস্যা হয় 5।পরিবারে কেউ বিপদগ্রস্ত হলে সে আস্থা হাড়ায়।

6।পরিবারের ছোটদের সাথে সম্পর্ক ভালো থাকে না বিশ্বাস রাখতো থাকেনা এবং সম্মানও থাকে না । 7।এছাড়াও সন্তানের সন্তানেরা তাদের স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশ্যে ব্যাহত হয় ।

8।পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বার্থপরতা এছাড়াও বাবা মা ছেলে মেয়ের সাথে যেহেতু তো সুন্দর সময় ব্যয় করতে পারেনা তাই তাদের মধ্যে একটা বিশাল গ্যাপ দেখা যায়।

তাই অবশেষে বলা যায় একটি পরিবার গঠনে পারিবারিক বন্ধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পারিবারিক কাঠামো শক্ত হোক সুন্দরভাবে বিকশিত হোক পারিবারিক বন্ধনের ফলে:

সভ্যতা ও প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে সব নর-নারীর মন-মানসিকতা। জীবনের প্রয়োজনে আমরা সবাই নিজেদের আপডেট করে নিচ্ছি। যারা যোগ্য তারাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। সংসার জীবনে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। স্ত্রীকে স্রেফ গতানুগতিক জীবনসঙ্গী না ভেবে মায়া-মমতায় ভরা, দায়িত্বে সজাগ, গুণেমানে আপসহীন, তাকে ছাড়া চলে না সংসারে একটি দিন, সত্যি সে প্রতিদিন তুলনাহীন-

আমাদের দিনের শুরুটা ঘর থেকেই। শেষটাও তাই। সময়ের সঙ্গে পালস্না দিয়ে পাল্টে যাচ্ছে আমাদের সবার জীবনযাপন প্রক্রিয়া। সকালের নাস্তার টেবিল থেকে শুরু করে পোশাক-আশাক কিংবা রূপচর্চা সব কিছুতেই পরিবর্তনের ছোঁয়া খুব সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু এত পরিবর্তনের পরেও পরিবারের বন্ধন আজও অটুট রয়ে গেছে। হয়তো সম্পর্কে টানাপড়েন বেড়েছে, যান্ত্রিকতার গ্রাসে পারিবারিক বন্ধনে আগের সেই আন্তরিকতার প্রকাশ কমে যাচ্ছে দিনে দিনে। কিন্তু তারপরও পরিবারের বন্ধনের প্রভাব শত কর্মব্যস্ততায় কিংবা অবসর সময়ে মানুষের প্রতিটি মুহূর্তকে স্পর্শ করে। আমাদের জীবনটা খুব বড় নয়। কিন্তু যতদিন আমরা বাঁচি সুন্দরভাবে বাঁচতে চাই। মানুষের জীবনচক্রকে খুব সহজভাবে বলতে গেলে শুরুটা হয়, বাবা-মায়ের সংসার থেকে। তারপর শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে বয়ঃসন্ধি অতিক্রম করা। কলেজের রঙিন জীবন আর নৈসর্গিক আঙিনা পেরিয়ে এক সময়ে নিজেই সংসার বাঁধে বাবা-মায়ের আদরের সেই সন্তানটি। এরপর এক সময় সেও সন্তানের বাবা-মা হয়। শুরু হয় আরেকটি প্রজন্মের পথচলা। প্রতিটি মানুষই পারিবারিক বন্ধনের এই চিরন্তন আবহের অন্তর্ভুক্ত। একক কিংবা যৌথ, পরিবার যাই বলি না কেন, যে কোনো মানুষের প্রথম প্রেরণার উৎস তার পরিবার। বাস্তবিক প্রয়োগে মানুষের জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বিয়ের আগের এবং বিয়েপরবর্তী জীবন। সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক দায়িত্ববোধ থেকে অভ্যস্ত হয়েছে পরিবার প্রথায়। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পরিবারবদ্ধ হয়ে থাকতে চেয়েছে। তবে যুগে যুগে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক কাঠামোতে পরিবর্তনের সঙ্গে পারিবারিক কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে আমাদের

চাহিদা অনুযায়ী। সুনিয়ন্ত্রিত হয়েছে সবার দাম্পত্য জীবন। স্বামী-স্ত্রীর পাস্পরিক সহযোগিতার এই চিরন্তন অবকাঠামোকে আমরা সহজভাবে বলি সংসার। বাস্তবতার আলোকে যথাযথ পরিকল্পনা হচ্ছে সুখের সংসারের ভিত্তি। সংসার সুখের হয় কেবল রমণীর গুণে নয়, বরং স্বামী-স্ত্রীর পাস্পরিক দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায়। এ প্রচেষ্টায় থাকে আবেগ-অনুভূতি, ভালোবাসা, মন্দলাগা শেয়ারিং। দুজন দুজনাতে ভালোভাবে সুখে-দুঃখে পাশাপাশি থাকা। একজনের মতামতের প্রতি অন্যজন গুরুত্ব দেওয়া, দুজনের প্রতি দুজনের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আস্থা, সহানুভূতি প্রভৃতি ভালোবাসায় যেমন গভীরতা আনে তেমনি দাম্পত্য জীবনে জটিলতা কমায়। দাম্পত্য জীবনটা চমৎকারভাবে এগিয়ে যায় সুখের এবং পরিতৃপ্তির চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে সাংসারিক নানা বোঝাপড়ার মাধ্যমে।

সংসারে একই ছাদের নিচে বহুদিন বাস করেও অনেক স্বামী-স্ত্রী জানতে পারেন না তাদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া থাকা চাই। নয়ত সাধ ও সাধ্যের স্বপ্নের সাজানো সংসার কোনো দিনই হবে না। সুখী দাম্পত্য জীবনকে বিশ্লেষণ করা কঠিন। কারণ, সুখটা আপেক্ষিক ব্যাপার। একেক জনের কাছে এর স্বরূপ একেক রকম। তারপরেও বলতে হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আস্থা, বোঝাপড়াটা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ভালোবাসা যতই থাকুক না কেন দুজনের মধ্যে বোঝাপড়াটা না থাকলে সুখী দাম্পত্য জীবন সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবল থাকারও দরকার আছে। এ ছাড়া দুজনের মধ্যে পরিবারকে গুরুত্ব দেওয়ার মানসিকতা থাকলে সুখী দাম্পত্য জীবন অসম্ভব কিছু নয়। জীবনের সুখ, দুঃখ, কষ্ট, ভালোলাগা, খারাপলাগা সবকিছু যদি ভাগাভাগি করে নেওয়া যায় তাহলে সংসারে সুখ গড়াগড়ি খাবে, নিশ্চিত করে বলা যায়। দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে দুজনের প্রতি দুজনের বিশ্বাস, আস্থা, সম্মান, শেয়ারিং ও ছাড় দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রী কেউ কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে পারবেন না। যার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে অবশ্যই ভালো লাগতে হবে। এ ক্ষেত্রে লোক দেখানো মেকি কোনো কিছুর উপস্থিতি মেনে নেওয়া যায় না। দুজনের মধ্যে বিশ্বাস শক্ত হতে হবে। 'কন্সিডারেট' ও 'সেক্রিফাইজিং মাইন্ডেড হতে হবে। এ দুটি শব্দ খুব শক্ত হলেও পরস্পরের প্রতি পছন্দের ক্ষেত্রে এ দুটি খুব সহজ সাবলীল হয়ে যায়।

দুজনকে বেশ বুদ্ধি খাঁটিয়ে চলতে হবে। সময়কে সুন্দরভাবে ভাগ করে নিলে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা পারিবারিক ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে না। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এ ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বোঝাপড়া না থাকলে সংসার বেশিদিন টিকে থাকার কথা নয়। দুজনের মধ্যে কম্প্রোমাইজ ভাবটা থাকতে হবে। তবে এটা বেশি হলে দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকে না। নিজেদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে কমফোর্টেবল থাকলে দাম্পত্য সুখের পথে আর বাধাবিপত্তি, প্রতিকূলতা থাকে না। এই পৃথিবীতে একেকজন একেক কারণে সুখী হয়। যা সব সময় নির্দিষ্ট করে বলাও যায় না। দাম্পত্য সুখের প্রধান শর্ত হলো, পারফেক্ট লাইফ পার্টনার খুঁজে নেওয়া। জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রায় সবাই দুজনের মধ্যে মেন্টাল অ্যাডজাস্টমেন্টকেই গুরুত্ব দেন। দুজনের মধ্যে যথার্থ রেসপনসিবিলিটি থাকতে হবে। দুজনের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া থাকলে অনেক সঙ্কটময় মুহূর্তও সহজে অতিক্রম করে আসা যায়। বিয়ের জন্য একটু সময় নিয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। যাকে ভালো লাগবে, যাকে ভালো বুঝতে পারা যায়-তাকেই বেছে নেওয়া উচিত। তবে বিয়ের আগে থেকে পরিচয় থাকুক বা না থাকুক বিয়ে পরবর্তী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই হবে সুখের সংসারের মূল্য চাবিকাঠি। এই পৃথিবীতে কবে কার সঙ্গে বিয়ে হবে এটা সৃষ্টিকর্তা নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখানে মনুষ্যত্ব বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ খুব। এটা থাকলে সব পাওয়া যায়। এটা না থাকলে সততা, উদারতা কিছুই তো টেকে না। সবার সামনে অথবা সমস্যা সৃষ্টি না করে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মানসিকতা ধরে রাখতে হবে। প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে ক্যারিয়ারের গুরুত্ব অনেক। দাম্পত্য জীবনে এ ক্ষেত্রে যদি বাধা আসে তাহলে সেই ক্যারিয়ার বেশি দূর যেতে পারে না। দুজনের পারস্পরিক সহযোগিতায় ক্যারিয়ারে সাফল্য তো আসবেই সেই সঙ্গে এটি তাদের নিয়ে যাবে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রথম স্তরে। একজনের কাজে অন্যজনের হস্তক্ষেপ কোনোভাবেই সুখকর কোনো ফলাফল বয়ে আনতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যদি কর্মজীবী হন এবং একই অফিসে চাকরি করেন সুবিধা-অসুবিধা থাকতেই পারে। একই অফিসে চাকরি করলে দুজনের কাজের এবং অবসর সময়টা একই হওয়ায় দুজন

দুজনকে যেমন সময় দিতে পারেন ঠিকঠাকমতো। তেমনিভাবে অফিসের বাইরের পরিকল্পনাগুলো সুন্দরভাবে মিলে যায়। এখানে ভুল বোঝাবুঝির তেমন অবকাশ থাকে না। ভিন্ন পেশায় থাকলে একে অন্যের ব্যস্ততার গুরুত্বটা ঠিক বুঝতে পারে না। একই পেশায় থাকাতে তাদের অধিকাংশ সময় আলোচনার বিষয়বস্তুই থাকে প্রফেশনকে নিয়ে। একই প্রফেশনে থাকার সুবিধা হলো একে অন্যের কাজে চাপ বোঝা যায়। সংসারে খরচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যত সুন্দরভাবে এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে সংসারও ততো সুন্দরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। মাসের শেষে স্বামীর কিংবা স্বামী-স্ত্রী দুজনের বেতনের টাকা একত্র করে কোন কোন খাতে কত খরচ হবে তার জন্য রাখতে হবে আলাদা আলাদা খাম। চাহিদা অনুযায়ী সে সব খামে বেতনের টাকাটা ভাগ হয়ে যায়। খরচাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সুকৌশলে। খরচটা আয়ের তুলনায় বেশি হলে তা মানসিক অস্থিরতার কারণ হতে পারে। আয়ের মধ্যেই সংসারের যাবতীয় চাহিদাকে সীমাবদ্ধ রাখলেই কোনোরকম অস্বস্তি কিংবা মানসিক অস্থিরতা তাড়া করবে না।

দাম্পত্য জীবনের একটি বড় অংশজুড়ে আছে সন্তান। স্বামী-স্ত্রীর সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর সন্তানের মুখটিই যেন প্রশান্তি বয়ে আনে। সন্তানের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সব উপাদানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বাবা-মায়ের। সন্তানের বেড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানকে যথেষ্ট সময় দিতে আন্তরিক হতে হবে বাবা-মা উভয়কেই। সন্তান হওয়ার পর পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব বেড়ে যায়। সংসারে সন্তান আসার আগে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক পরিবেশ তৈরি করা। ওর পড়াশোনা, বেড়ে ওঠার পরিকল্পনা এখন থেকেই করতে হবে। পরিকল্পিত পরিবারই শুধু নয়, যাপিতজীবনে পরিকল্পিত যে কোনো বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেকেই বলেন, ডবল ও সিঙ্গেল লাইফের ব্যবধান আকাশ আর পাতাল। বিবাহিত জীবনটা উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ইচ্ছার ওপর। যদি এ ক্ষেত্রে কোনো গ্যাপ থাকে তাহলে জীবনটা সে রকম বর্ণাঢ্য হয়ে উঠতে পারে না। সংসারে এক ধরনের টানাপড়েন লেগে থাকে নিত্যদিন। জীবনে স্থিতিশীলতা এনে দেয় সংসার জীবন। দাম্পত্য জীবনে ঝগড়াঝাটি কিংবা মতের

অমিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে হতেই পারে। তবে সময়ই আবার সব ঠিক করে দেয়। রিঅ্যাক্ট করলে সমস্যা বাড়ার সম্ভাবনা বেশি। রিঅ্যাক্ট যতটা কম করা যায় ততই ভালো। দাম্পত্য সঙ্কট সংসার জীবনের একটি অংশ, এটা মনে রাখতে হবে সবাইকে। এ নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। অনেক সংসারেই দেখা যায় স্বামী-স্ত্রী রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটান একে অন্যের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে। তবে তারা বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারেন না। পরে সবকিছুই ঠিক হয়ে যায়। এটা চিরন্তন একটি ছবি প্রতিটি সংসারে। একটা বিষয় ধরে বসে থাকাটা ঠিক নয়। একে অন্যের নিজস্ব সত্তাটা নিয়ে মাথা না ঘামালে সঙ্কট কম হয়। যেহেতু দুজন নর-নারী দুটি ভিন্ন সত্তা নিয়ে বেড়ে ওঠে। তাই বিয়ের পর রাতারাতি একজন আরেকজনের মনের মতো হয়ে যাবে এটা সম্ভব নয়। পারস্পরিক ম্যাচিং এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য সময় দেওয়া উচিত। যে কোনো সঙ্কটে নার্ভাস না হয়ে, মাথা গরম না করে, দুজনের আলোচনার ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে হবে। ভুল স্বীকার করলে ছোট হয়ে যেতে হয় তেমন মানসিকতা থাকলে তা ঝেড়ে ফেলতে হবে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই। ভুল স্বীকার করলে সংসারে শান্তি-স্বস্তি এমনিতেই চলে আসে। দুজন দুজনকে একই সঙ্গে পয়েন্ট আউট করলে মূল সমস্যার সমাধান হবে না। সঙ্কট যেমন কারও কাম্য নয় আবার সঙ্কট না থাকলেও সংসার জীবন একঘেয়ে ক্লান্তিকর মনে হয়। তবে দাম্পত্য সঙ্কট বাড়তে দেয়াটা ঠিক নয়। এটা দীর্ঘস্থায়ী হলে সংসারে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে- এটা সবাইকে মনে রাখতে হবে। সভ্যতা ও প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে সব নর-নারীর মন-মানসিকতা। জীবনের প্রয়োজনে আমরা সবাই নিজেদের আপডেট করে নিচ্ছি। যারা যোগ্য তারাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। সংসার জীবনে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। স্ত্রীকে স্রেফ গতানুগতিক জীবনসঙ্গী না ভেবে মায়া-মমতায় ভরা, দায়িত্বে সজাগ, গুণেমানে আপসহীন, তাকে ছাড়া চলে না সংসারে একটি দিন, সত্যি সে প্রতিদিন তুলনাহীন- ভাবতে হবে।

সুস্থ বিকাশের জন্য চাই পারিবারিক বন্ধন:

পরিবার হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এবং এ কারণে পরিবারকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সৌহার্দ, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার দৃঢ় বন্ধনের মাধ্যমে পরিবারে একজন মানুষ সমাজের সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করে থাকে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও সাংস্কৃতিক পরিসরে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবারকে বলা হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের আয়না। রাষ্ট্রের সামাজিক উন্নয়নে পরিবারের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারই একজন মানুষের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। পরিবারের প্রতি গুরুত্ব ও সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর ১৫ মে তারিখে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৯৩ সালে দুনিয়াজুড়ে পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে ও পরিবারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ১৫ মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালনের ঘোষণা করে জাতিসংঘ।

এই বিশেষ দিনটি পালনের পেছনে যে কারণটি নিহিত রয়েছে তা হলো সমাজের উন্নয়নের জন্য প্রথমে দরকার একটি সুষ্ঠু পরিবার। ছোট-বড় সব সদস্যের নিরাপদ ও নিশ্চিত জায়গা হলো পরিবার। পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো ও ঐতিহ্য যাতে অটুট থাকে, আর্থসামাজিক সমস্যাগুলো যাতে পরিবারগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্য, পরিবারের কাজের সামঞ্জস্য বজায় রাখার লক্ষ্যেই এই আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস।

সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে পরিবার হচ্ছে সমাজ জীবনের ভিত্তিভূমি। পরিবারই সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার সূচনা করে। পরিবারকে সমাজ দেহের হৃৎপি-ের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই হৃৎপি- যদি দুর্বল বা বিকল হয়ে পড়ে তাহলে পুরো সমাজব্যবস্থাই বিকল হয়ে যায়। সমাজ জীবনের মূল্যবোধের যত অবক্ষয় ঘটেছে তার অধিকাংশেরই কারণ বিশ্লেষণে দুর্বল পারিবারিক ব্যবস্থাকে দায়ী করা হয়। পরিবার শিশুর প্রাথমিক ও নৈতিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। এখান থেকেই তার চরিত্রের ভিত্তি

গড়ে ওঠে। তাই পরিবারে মা-বাবার প্রধান দায়িত্বইহচ্ছে সন্তানকে শৈশব থেকেই নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে সন্তানকে গড়ার জন্য বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। সন্তানকে মাঝেমধ্যে কাছে কিংবা দূরে কোথাও প্রকৃতির সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে হয়। ভ্রমণেও শিশু অনেক কিছু শিখতে পারে। বর্তমান শহুরে সমাজে অনেক পরিবারের অভিভাবক বাবা-মা উভয়ই নিজ কর্মস্থলে ব্যস্ত থাকে। ফলে তাদের কাছ থেকে যতটুকু সময় সন্তানের প্রাপ্য তা থেকে সে বঞ্চিত হয়। তাই কার্টুন ছবি দেখে আর মোবাইল-গেম খেলে শিশু সময় কাটায়। এতে তার মস্তিষ্ক ধারণ করে যতসব উদ্ভট চিন্তা।

পরিবারের যৌথ কাঠামো এই সামাজিক বন্ধন ও নৈতিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। বড়দের মান্য করা, প্রত্যেক সম্পর্ককে সম্মান করা- এসব কিছুই তারা গুরুজনদের কাছ থেকে শিখে। সেই পারিবারিক সম্পর্ক এখন দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার হচ্ছে এবং এ কারণে সবাই এখন চারপাশের জীবন ও জীবিকা নিয়ে মহাব্যস্ত। ফলে অসুখী দাম্পত্য জীবন, সন্তানের লেখাপড়া, ক্যারিয়ার নিয়ে এত ব্যস্ত যে, চাওয়া-পাওয়া আর উন্নতির চক্রে ঘুরছে সবকিছু। পরিবার থেকে সন্তানরা সামাজিক অনুশাসন মূল্যবোধ না শেখায় ভালোমন্দ বুঝতে পারছে না। অন্যদিকে, বর্তমান সময়ে আধুনিক নগরায়ণ ও শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানসহ নানান কারণে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার হচ্ছে। কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বন্ধন এবং পারিবারিক কাঠামোতে যে পরিবর্তন এসেছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রবীণদের জন্য যথেষ্ট সেবাব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এই পরিস্থিতিতে অনেক প্রবীণ অরক্ষিত হয়ে পড়ছে। পারিবারিক ভাঙনে যৌথ পরিবার থেকে ছিটকে পড়ছেন প্রবীণরা। যার কারণে শেষ বয়সে পরিবার-পরিজন ছেড়ে বৃদ্ধাশ্রমে তাদের নির্ভরশীলতা বাড়ছে।

পারিবারিক অনুশাসনের বাইরে চলে যাওয়ায় অভদ্রতা, অসম্মান করা আধুনিক ও স্মার্টনেস জ্ঞান বলে মনে করছে। ভদ্রতা, সম্মান করা এসব বিষয় পরিবারের কাঠামো দাদা-দাদি, ফুফু, চাচা-চাচিদের কাছ থেকে শিখবে। কিন্তু যৌথ থেকে একক পরিবারে

রূপান্তরিত হওয়ার কারণে শিশুটি কাজের মানুষটির কাছে সার্বক্ষণিক থাকায় কিছুই শিখতে পারছে না। তাই শিশুর আদর্শিক জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন যৌথ পরিবার। আসলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে যৌথ পরিবারের সুবিধা, ঐতিহ্য ও সামাজিক বন্ধন। এগুলো এখন শুধু সোনালি অতীত মনে করিয়ে দেয়।

রাষ্ট্র পরিচালনায় যেমন কিছু নিয়মনীতি আছে, তেমনি পরিবারেরও নিয়মনীতি রয়েছে। যেমন : পরিবারের সবার সঙ্গে সদ্ভাব গড়ে তোলা, সাংসারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, মিথ্যা না বলা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, নির্দিষ্ট সময়ে ঘরে ফেরা, নিজের কাজ নিজে সম্পন্ন করা এবং মানবিক মূল্যবোধগুলোর চর্চার মাধ্যমে অন্তরকে বিকশিত করা প্রভৃতি। মানবজীবনে প্রত্যেক মানুষের জন্য এই পারিবারিক শিক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ। আর এগুলো আয়ত্ত করতে পরিবার-ই সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। নানান চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করতে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। ভদ্রতা, নৈতিকতা, দায়িত্বশীলতা, কৃতজ্ঞতাবোধ শেখা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন, কনিষ্ঠদের স্নেহ-আদর করা, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা, পরোপকারিতার মানসিকতা গড়ে তোলা, উদার মানসিকতাবোধ জাগ্রত করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যতটা না অর্জন করা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিবার থেকে অর্জন করা যায়।

মা-বাবা, ভাইবোন, পাড়া-প্রতিবেশীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ চরিত্রের প্রয়োজনে পারিবারিক সুশিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসনকে একেবারে গুরুত্বহীন মনে করে। পারিবারিক সুশিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন পরিপালনে বাবা-মায়ের ভূমিকা ব্যাপক। পরিবার ও সমাজের যুবকদের চরিত্র গঠনের জন্য বাবা-মা, কর্তাব্যক্তিদের এগিয়ে আসা দরকার। শুধু মাদক ও সন্ত্রাস নির্মূলের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে পারিবারিক সুশিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। মানসিক বিকাশ ও নৈতিক চরিত্র গঠনে পারিবারিক সুশিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত মায়ের কোলে শিশুর শিক্ষার হাতেখড়ি। পরিবার থেকেই শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। ফলে পরিবার মানব সন্তানের প্রথম শিক্ষা নিকেতন। সন্তানের মূল্যবোধ, চরিত্র, চেতনা ও বিশ্বাস জন্ম নেয় পরিবার থেকেই। বাবা-মা যেমন আদর্শ লালন করেন, তাদের

সন্তানরাও সেটা ধারণ ও লালন করার চেষ্টা করে। পরিবার হলো প্রেমগুপ্রীতি ভালোবাসা ও মায়া-মমতায় ভরা এমন একটি সুসজ্জিত বাগানের মতো যেখানে প্রতিটি সদস্য তার চারিত্রিক গুণাবলি বিকশিত করার পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। নৈতিক গুণাবলিসমৃদ্ধ হয়ে তারা পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সুশোভিত ও মোহিত করে। এটা এমন এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল, যা বাইরের যাবতীয় পঙ্কিলতা ও আক্রমণ থেকে শিশুসন্তানকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম।

পারিবারিক একাত্মতা জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলে। সমাজ বিজ্ঞানীরা রীতিমতো জোর দিয়ে বলছেন, পারিবারিক সম্প্রীতির সঙ্গে মানুষের দীর্ঘায়ু অর্জনের সম্পর্কটা একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত। তাদের মতে, বাবা-মা, সন্তান ও ভাইবোনদের সঙ্গে কাটানো আনন্দঘন মুহূর্ত দীর্ঘায়ু লাভে বিশেষভাবে সহায়ক। কিন্তু পারিবারিক বন্ধন যাদের দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে উল্টোটা ঘটতে পারে। পারিবারিক একাত্মতার সুফল মানুষ পেতে শুরু করে জীবনের গোড়া থেকেই। যেসব পরিবারে বাবা-মা ও সন্তানদের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক বিরাজমান, ক্যানসারের মতো অসুখে পড়ার সম্ভাবনাও তাদের কম এবং এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যেসব পরিবারে একত্রে খাওয়া-দাওয়ার রীতি চালু আছে, তারা তুলনামূলক সুস্থ খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত।

বিশ্বজুড়ে আধুনিক ধারার সমাজবিজ্ঞানী এবং স্বাস্থ্য-গবেষকদের সাম্প্রতিক গবেষণার ভিত্তিতে এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে, পারিবারিক ও সামাজিক একাত্মতা একজন মানুষকে সুস্থ সুখী সফল জীবনের পথে চালিত করে। তাই আমাদেরও উচিত এ যূথবদ্ধ জীবনযাপনের প্রতিটি সুযোগকেই কাজে লাগানো এবং প্রয়োজন আমাদের উত্তর প্রজন্মকেও সাধ্যমতো এমন জীবনধারায় অভ্যস্ত করে তোলা। তাই যেকোনো বিষয়ে পারিবারিক আলোচনা, পরিবারের সবাই অন্তত একবেলা একসঙ্গে খাওয়া ইত্যাদি আচরণ-অভ্যাসের পাশাপাশি সঙ্ঘবদ্ধভাবে নৈতিকতার চর্চায়ও মনোযোগী হওয়া দরকার। সুষম পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সব পরিবারের সদস্য এবং প্রিয়জনদের পরিচালিত করুক সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের পথে- এ প্রত্যাশা সবার।

সন্তান পালনে পারিবারিক বন্ধন কেন জরুরি:

মানুষ কখনো একাকী বাস করতে পারে না এজন্য প্রয়োজন পরিবার।

মানুষ মানুষের জন্য পৃথিবীটা এখনো সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন যেখানে বন্ধনটা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ যে বন্ধুদের জন্যই একে অপরের জন্য অনেক কিছু করে থাকে মা তার স্বামীর জন্য মা তার সন্তানের জন্য পিতার সন্তানের জন্য একটি সন্তান তার পিতামাতার জন্য এত সুন্দর করে পৃথিবীতে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন যা আমাদের জন্য অনেক সুন্দর ক্ষেত্র স্বরূপশিশুর সঙ্গে তার পরিবারের মানুষগুলোর বন্ধন শিশুর সঠিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

।

প্রত্যেক মা-বাবাই চান সুস্থভাবে বেড়ে উঠুক তাঁর সন্তান। মেধায়-মননে হয়ে উঠুক অনন্য। তবে সন্তানের বেড়ে ওঠা বলতে অনেক মা-বাবা শুধু শারীরিক বেড়ে ওঠাই বোঝেন। তাই সন্তানের বেড়ে ওঠার এই যাত্রায় প্রাধান্য পায় খাওয়াদাওয়া। তবে সন্তানের সার্বিক সুস্থতা শুধু সুষম খাবারের ওপরই নির্ভর করে না। যে পরিবেশে সে বেড়ে উঠছে, তার ওপরেও নির্ভর করে তাদের বিকাশ।

শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছর তার বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়েই শিশুর প্রায় ৮০ ভাগ মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ (এনআইইউ)–এর গবেষণা বলছে, শিশুর জন্মের প্রথম দুই বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় শিশুর সঙ্গে তার পরিবারের মানুষগুলোর বন্ধন শিশুর ভবিষ্যতের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে যত্নশীল না হলে সে দীর্ঘমেয়াদি মানসিক ও শারীরিক সমস্যায় ভুগতে পারে। এমনকি তার সম্ভাবনাময় গুণাবলিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সুষ্ঠ সমাজ গঠনে কেন গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বন্ধন?

যতই ব্যস্ততা থাক সন্তান সময় দিতে হবে।

জন্মের পর শিশুর সঙ্গে পরিবারের মানুষগুলোর সম্পর্কই হয় তার প্রথম পাঠ। মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য মানুষের সান্নিধ্যে থেকে এরা নিজের এবং বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা পায়। এই সম্পর্কের মাধ্যমে শিশুরা শেখে, কীভাবে অনুভূতি প্রকাশ করতে হয়। একটা শিশু যখন হাসে, কাঁদে, জিদ করে বা কোলে উঠতে চায়—তখন সে খেয়াল করে তার চারপাশের মানুষ তাকে কী 'উত্তর' দিচ্ছে। এটাই তার জন্য শেখার প্রথম ধাপ। কীভাবে ভাবতে হয়, বুঝতে হয়, কথা বলতে হয়, আবেগ প্রকাশ করতে হয়—এসব সামাজিক আচরণ ও যোগাযোগের দক্ষতা তাদের জন্মের প্রথম কয়েক বছরেই গড়ে ওঠে।

তবে শুধু সন্তানের সঙ্গেই নয়, আশপাশের মানুষের সঙ্গে আপনার আচরণও প্রভাব ফেলে সন্তানের বিকাশে। আপনার সঙ্গী, বন্ধু, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, ঘরের কাজে সহায়তাকারীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছেন, তা শিশুরা খেয়াল করে। অনুকরণ করে। এভাবে তারা পরিবার এবং বাইরের মানুষের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে হয়, শিখে নেয়। হালে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে গ্যাজেট। ইউটিউব বা মুঠোফোন থেকেও অনেক শিশু নানা বিষয়ে শিখে থাকে।

শক্ত পারিবারিক বন্ধন গড়ে তুলতে হল সন্তানদের শেখাতে হবে খেলাচ্ছলে।ব্যস্ততায় মোড়া এই শহুরে জীবনে আলাদা করে সময় খুঁজে বের করা কঠিন। তার চেয়ে বরং তৈরি করে নিন নিজস্ব কিছু ঘরোয়া রীতি। এতে যেমন আলাদা করে সময় খুঁজতে হয় না, তেমনি সবাইকে একসঙ্গে বেঁধে রাখতেও এটি খুবই কার্যকর।

একসঙ্গে খেতে বসুন: কর্মজীবী মা-বাবার ক্ষেত্রে সকাল বা রাতের খাবারই হয়তো একমাত্র সময়, যখন পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসার সুযোগ পান। এই সময়টুকু মুঠোফোন বা অন্যান্য কাজ থেকে বিরত থাকুন। সন্তানকে গল্প বলুন, সারা দিন সে কী কী করেছে বা করতে চাইছে, জেনে নিন। পাশাপাশি সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন নিজের কোনো মজার ঘটনা বা অভিজ্ঞতা। এতে খেতে বসলেই টিভি বা মুঠোফোনের প্রতি শিশুর আকর্ষণ কমে আসবে। সে খাওয়ায় মনোযোগী হতে শিখবে, পাশাপাশি এই সময়ের গল্প, হাসিঠাট্টা শিশুকে মানসিকভাবে চাপমুক্ত থাকতে সাহায্য করবে। সন্তান যাকে ভালোবাসে, আপনার তাকে পছন্দ না!

আচার-ঐতিহ্য পালন: প্রত্যেক পরিবারেই কিছু আচার-ঐতিহ্য থাকে। শিশুকে ছোটবেলা থেকে সেসব পালনে উৎসাহিত করুন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পারিবারিকভাবে উদ্‌যাপিত দিনগুলো সবাই একসঙ্গে পালন করুন। শিশুকে শোনান এই বিশেষ দিনগুলোর তাৎপর্য। ইতিহাস জানার পাশাপাশি এতে তার মধ্যে স্বকীয়তা বোধ তৈরি হবে।

সবাই মিলে ঘরের কাজ: শিশুকে ঘরের কাজে উৎসাহিত করতে সবাই মিলে ঘরের কাজ ভাগ করে নেওয়ার বিকল্প নেই। ঘরের কাজে সহায়তাকারী থাকলেও বয়স অনুযায়ী ঘরের নানান কাজে আপনার শিশুকেও যুক্ত করুন। এতে শিশু যেমন দায়িত্ব নিতে শিখবে, তেমনি তার মধ্যে সবার সঙ্গে কাজ করার গুণ ছোটবেলা থেকেই গড়ে উঠবে।

বাইরে ঘুরতে গেলে শিশু সুস্থ থাকবে ,এছাড়াও ঘুরতে যান, একসঙ্গে খেলা : পরিবারের সবাই মিলে ঘুরতে যাওয়া।এতে মুঠোফোন, ট্যাব ব্যবহারের আসক্তি কমবে। সব সময়ই যে দূরে কোথাও ঘুরতে যেতে হবে, এমন নয়। শিশুকে নিয়ে পার্ক, চিড়িয়াখানা, জাদুঘরে যেতে পারেন। ঘোরার পাশাপাশি শিশুকে সক্রিয় রাখতে তার সঙ্গে খেলুন। বাসার ছাদেই খেলতে পারেন। এতে সে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকবে।

আরও যা করতে পারেন: শিশুর সঙ্গে কোনো প্রোজেক্ট করুন। শিশু ছোট হলে তার সঙ্গে লুকোচুরি, রং করা, পাজল মেলানো, , নানান জিনিসের নাম শেখানোর মতো

কাজে কাটতে পারে দারুণ সময়। আর সন্তান একটু বড় হলে তার সঙ্গে শব্দের খেলা খেলুন, কাগজ বা কাপড় কেটে বানান মজার মজার জিনিস, লেগো মেলান, বোর্ড গেম খেলুন। বাগান পরিচর্যা করা, ঘরে কোনো প্রাণী থাকলে এগুলোকে খাবার দেওয়া, স্কুলের কোনো কাজে সাহায্য করার মতো ব্যাপারে সন্তানের পাশে থাকুন, তাকে উৎসাহ দিন। এসব কাজ করার সময় তার সঙ্গে কথা বলুন। তাকে ভাবার সুযোগ করে দিন।

সন্তান পালনে প্রত্যেক মা-বাবা অবর্ণনীয় কষ্ট করেন। তবে শিশু যখন দায়িত্বশীল, ইতিবাচক গুণাবলি নিয়ে বেড়ে ওঠে, তখন কষ্টটাকে মনে হয় সার্থক!

শুধু সন্তানকে না শিখিয়ে তার থেকে যা আশা করেন, তা নিজেরা পালন করুন। ভালো অভ্যাস তৈরি করার জন্য অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখুন। তবে মনে রাখবেন, শিশু লালনপালনের ক্ষেত্রে সব সময় আপনি নিখুঁত হতে পারবেন না। বাইরের প্রভাব থেকেও শিশুকে সব সময় দূরে রাখা সম্ভব নয়।

আমাদের জীবনে পরিবারের ও বন্ধনের গুরুত্ব:

পারিবারিক জীবন ব্যতিরেকে মানবসভ্যতা কল্পনা করা যায় না। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, উন্নতি-অগ্রগতির জন্য সুষ্ঠু পারিবারিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পারিবারিক জীবন অশান্ত ও পীড়াদায়ক হলে, তাতে ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দিলে সমাজজীবনে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সুতরাং পরিবারই হচ্ছে কল্যাণকর সমাজের ভিত্তি।

এছাড়াও পরিবারগুলো আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং আমাদের ভালোবাসার অনুভূতি জাগায় । তারা আমাদের শক্তির স্তম্ভ যারা কখনও পড়ে না বরং আমাদের

শক্তিশালী রাখে যাতে আমরা আরও ভাল মানুষ হয়ে উঠি। আমরা ভালবাসা, সম্মান, বিশ্বাস, আশা, যত্ন, সংস্কৃতি, নীতি, ঐতিহ্য এবং আমাদের পরিবারের মাধ্যমে আমাদের উদ্বেগজনক সবকিছুর মূল্যবোধ শিখি।

তথ্যসূত্র: https://www.toppr.com › essays › es...

আলগা হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন:

দেশের তরুণেরা বলছেন, পরিবারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া বিষয়েই তাঁদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বেশি। মা-বাবার সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব বাড়ছে। মা-বাবা দুজনেই আয়-রোজগারে সম্পৃক্ত হওয়া কারণেই কি দূরত্ব কমছে না, এ প্রশ্নটাও এসেছে জরিপে। সব মিলিয়ে মা-বাবা ও পরিবারের সঙ্গে মানিয়ে চলার বিষয়টি নিয়ে তরুণেরা আগের মতোই বেজায় উদ্বিগ্ন।

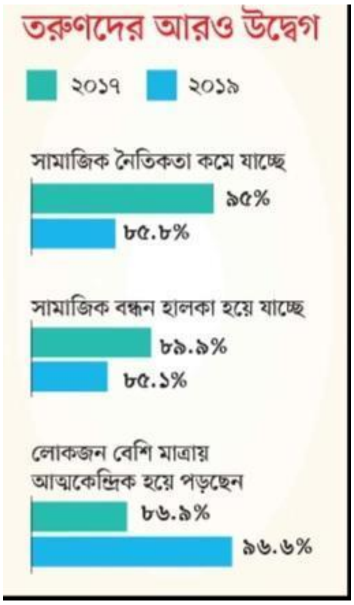

সারা দেশের ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী ১ হাজার ২০০ তরুণের মতামতের ভিত্তিতে জরিপট তৈরি করা হয়েছে।

জরিপে অংশ নেওয়া তরুণদের কাছে প্রশ্ন ছিল, কোন তিনটি বিষয় নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি। তরুণেরা সবচেয়ে বেশি বলেছেন পরিবারের সঙ্গে খাপ খাওয়ার বিষয়টির কথা। যেমন ৪৫ দশমিক ৪ শতাংশ তরুণ পরিবারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারাকেই তাঁদের প্রধান উদ্বেগ বলে মনে করেন। জীবনের লক্ষ্য, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, চাকরিবাকরি বা পড়াশোনা—কোনোটাতেই তাঁরা এর সমান উদ্বেগের জায়গা বলে মনে করেন না।

তবে দুই বছরের ব্যবধানে এ ক্ষেত্রে উদ্বেগের মাত্রা কিছুটা কমেছে। যেমন প্রথম আলোর করা ২০১৭ সালের জরিপে তরুণদের কাছে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন ৫৪ দশমিক ৫ শতাংশ তরুণের সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ ছিল পরিবার নিয়ে।

সন্তানদের সঙ্গে মা-বাবার সম্পর্ক

জরিপে অংশ নিয়ে ১০ জনে প্রায় ৮ জন মনে করেন, মা-বাবার সঙ্গে সন্তানদের দূরত্ব বাড়ছে। তরুণদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কেন এই দূরত্ব এবং এতে কি পারিবারিক বন্ধনও আলগা হয়ে যাচ্ছে। একই ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল ২০১৭ সালের জরিপেও। দেখা যাচ্ছে, তরুণদের মনোভাবের খুব বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি। যেমন ২০১৭ সালে ৪৭ দশমিক ৭ শতাংশ তরুণ সম্পূর্ণভাবে একমত ছিলেন যে সন্তানদের সঙ্গে মা-বাবার দূরত্ব বাড়ছে। ২০১৯ সালে এসে দেখা যাচ্ছে, এ রকম মনে করার সংখ্যাটা সামান্য বেড়েছে। এখন ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ তরুণই এমনটা মনে করেন। আর এ প্রশ্নে কিছুটা সম্মত ২৯ দশমিক ২ শতাংশ তরুণ, ২০১৭ সালে যা ছিল ৩৮ শতাংশ। আর মা-বাবার সঙ্গে সন্তানদের দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার বিষয়ে একমত নন এক-পঞ্চমাংশ তরুণ।

জরিপে অংশ নেওয়া তরুণদের সিংহভাগ অবশ্য একটি বিষয়ে বয়স-লিঙ্গ-শিক্ষানির্বিশেষে একমত হয়েছেন। যেমন জরিপে অংশ নিয়ে তরুণেরা বলছেন, মা-বাবা দুজনেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, অর্থাৎ চাকরি বা ব্যবসায় অংশ নেওয়ায় দূরত্ব

বাড়ছে বেশি। ৭৮ শতাংশ তরুণের মত এটি। তাঁরা মনে করেন, এই কারণে মা-বাবার কাছ থেকে সন্তানেরা দূরে সরে যান এবং তার ফলস্বরূপ পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

দুই বছর আগের করা জরিপে মা-বাবার আয়-রোজগারে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টিকে আরও বেশি তরুণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ওই সময় ৮৫ শতাংশের বেশি তরুণ একে মা-বাবার সঙ্গে সন্তানদের দূরত্ব বৃদ্ধির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

পরিবারগুলোয় যখন এমন চিত্র, তখন সমাজও এর কারণে ভুগছে। জরিপে তরুণেরা বলেছেন, দেশে সামাজিক বন্ধন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। জরিপে অংশ নেওয়া তরুণদের ৭৮ দশমিক ৩ শতাংশের মত এটি। তবে ২০১৭ সালের জরিপে আরও বেশি তরুণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। তখন এর হার ছিল ৮৫ দশমিক ৩ শতাংশ।

সবাই যা বলছেন

পরিবার নিয়ে গুণগত জরিপেও দেখা গেছে একই চিত্র। গুণগত জরিপে ২০ জনের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ছয়জন ছিলেন বিশেষজ্ঞ আর সাতজন পুরুষ ও সাতজন নারী। তাঁদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, দেশের তরুণেরা কি আগের তুলনায় বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছেন, তাঁরা কি অনলাইনে খুব বেশি অনুৎপাদনশীল সময় কাটাচ্ছেন এবং ক্রমশ মা-বাবার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।

তরুণেরা এ বিষয়ে বলছেন, সন্তানেরা মা-বাবার কাছ থেকে মনোযোগ ও সময় পাচ্ছেন না। বিশেষ করে মা-বাবা উভয়েই কর্মজীবী হলে এই সংকট আরও তীব্র হয়। বাবা-মায়েরাও সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে (ফেসবুক, ইউটিউব প্রভৃতি) আসক্ত হয়ে পড়ছেন। কিছু ক্ষেত্রে সন্তানকে টেলিভিশনে কার্টুন সিরিজ দেখতে বসিয়ে বাবা-মায়েরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সময় কাটাচ্ছেন।

আবার জরিপে অংশ নেওয়া তরুণদের একাংশ বলছেন, বাবা-মায়েরা কিছু ক্ষেত্রে সন্তানদের ওপর শৃঙ্খলার বিষয়টি চাপিয়ে দিচ্ছেন এবং এ বিষয়ে অতিরিক্ত কঠোরতা দেখাচ্ছেন। তাঁরা সন্তানদের ওপর অতিরিক্ত চাপ দিচ্ছেন পড়াশোনার বিষয়েও। কিন্তু সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে মা-বাবার আগ্রহ কম। ফলে সন্তানদের সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব বেড়েই চলেছে। আর এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে সন্তানদের নৈতিক স্খলন হচ্ছে, তাঁরা আটকে পড়ছেন মাদক ও হতাশার ফাঁদে।সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতে সুখের ঘরে ঢুকে পড়ছে দুঃখের আগুন। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা। ভেঙে যাচ্ছে পারিবারিক বন্ধন। আর এর অন্যতম কারণ হিসেবে প্রথমে ধরা হয় পরকীয়ার বিষয়টি। এ ঘটনায় একের পর এক তছনছ হচ্ছে সাজানো সংসার। বাড়ছে খুনোখুনির ঘটনাও। বাবা-মায়ের দাম্পত্য কলহের জেরে অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে নিষ্পাপ শিশু-সন্তানরা। পরবর্তীতে এ শিশুরা জড়িয়ে পড়ছে নানা অপরাধে। শিশুকাল থেকে পিতৃ-মাতৃহীনতার কারণে ঢুকে যাচ্ছে অন্ধকার জগতে। তারা আক্রান্ত হচ্ছে নানা মানসিক রোগে এবং ঝরে পড়ছে বিদ্যাপীঠ থেকে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, রাজধানীর দুটি সিটি করপোরেশনে প্রতিদিন অস্বাভাবিক হারে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। তালাক দেওয়ার দিক থেকে এগিয়ে

নারীরা। মোট তালাকের ৬৮ দশমিক ১৯ শতাংশ স্ত্রী এবং ৩৩ দশমিক ০৪ শতাংশ স্বামীর পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে। গত ছয় বছরে ঢাকা মহানগরীতে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে ৩০ হাজার ৮৫৫টি। দৈনিক হিসাবে প্রতিদিন রাজধানীতে প্রায় ১৪ দম্পতির মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। মহানগরের ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যে এমন চিত্র পাওয়া যায়।

গত ছয় বছরে দুই সিটিতে বিবাহবিচ্ছেদের নোটিস পড়েছে ৩৬ হাজার ৩৭১টি। এর মধ্যে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে ৩০ হাজার ৮৫৫টি। স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীকে তালাকের নোটিস পড়েছে ২৪ হাজার ৮০৩টি এবং স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে তালাকের নোটিস ১২ হাজার ১৮টি। এ হিসাবে প্রতিদিন গড়ে ১৫টি, মাসে ৪২৯টি এবং বছরে ৫ হাজার ১৪৩টি বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। এসব নারীর বেশির ভাগের বয়স ৩০-৩৫ বছর। এ ক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের নারী বেশি। তালাকের ক্ষেত্রে বিবাহের মাত্র এক বছরের মাথায় বিচ্ছেদের ঘটনাই প্রবল।

কিন্তু কেন এই বিচ্ছেদ? অপরাধ বিশ্লেষক ও মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মোবাইল ফোন, চ্যাটবক্স, ফেসবুক, যৌতুক, নেশার উন্মাদনা, বিপরীত লিঙ্গ থেকে যৌন চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে দাম্পত্য কলহ, পরকীয়া, আর্থিক দৈন্য, বিদেশি (বিশেষ করে ভারতীয়) টিভি চ্যানেলের নাটক-সিনেমার প্রভাবসহ মানসিক হীনম্মন্যতার কারণে বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে। ফলে ভাঙছে সংসার। বিষয়গুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হলেও মূল বিষয় কয়েকটি। পরকীয়া, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন ও দাম্পত্য যৌনজীবন। পরকীয়ার বিষয়টি সবার ওপরে। মোবাইল ফোন আর ফেসবুকের মাধ্যমে দিনে দিনে মানুষ এই অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। আর এই অপরাধকে উসকে দেওয়ার জন্য রয়েছে বিশেষ করে বিদেশি টিভি চ্যানেলের নাটক ও সিনেমা। বিষয়গুলো যে শুধু পারিবারিক বাঁধনই ছিন্ন করছে তা নয়, আত্মহত্যার মতো অসংখ্য ঘটনারও জন্ম দিচ্ছে। আমাদের উদার মানসিকতায় ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন রকমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। শুধু যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন তা নয়, সন্তানরাও হরহামেশা ঘটিয়ে যাচ্ছে এই অপরাধ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন। ফেসবুক, চ্যাটবক্সের মাধ্যমে যে পরকীয়ার সূত্রপাত হয়, তাও এই জীবনযাপন থেকেই শুরু হয়। শহুরে জীবনযাপনে যারা অভ্যস্ত তারা প্রতিক্ষণে এই জীবনযাপনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ছে। আজকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কোনো বিষয়কে উদযাপন করার জন্য এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনকে বেছে নিচ্ছে। ডিজে পার্টি, বিভিন্ন নিষিদ্ধ পানীয় পান থেকে শুরু করে রাত যাপন এখন অনেক সহজসিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। যা বাবা-মা থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে সন্তানের ওপরে এসে ভর করছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরা আমাদের জীবনকে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু খুব ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, পাশ্চাত্যে পারিবারিক বন্ধন বলে তেমন কিছু নেই।

পারিবারিক এ ভাঙনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে শিশুদের ওপর। যে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল থাকে, সেখানকার সন্তানরাও মানসিক সমস্যায় ভোগে। ভবিষ্যতে ওই সন্তান জড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধে। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায় তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। তাই স্বামী ও তার পরিবারের নির্যাতন তারা এখন আর মুখবুজে সহ্য করছেন না। তাই বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা বাড়ছে। এটিও বিবাহবিচ্ছেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকেই উচ্চাভিলাষী হওয়ার কারণে দু'হাতে টাকা কামানোর জন্য এভাবেই তাদের জীবন সাজিয়ে নিচ্ছেন। যে কারণে নারী খুব সহজেই তার সিদ্ধান্ত নিতে পারছে। আর বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে সন্তানরাও মানুষ হচ্ছে লাগামহীনভাবে।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়া অবস্থায় অনেকেই প্রেমে জড়িয়ে পড়ে গোপনে বিয়ে সেরে ফেলছে। এরপর কয়েক বছর যেতে না যেতেই পরিবারের মনরক্ষা অথবা নানা দৈন্যদশায় পড়ে তারা তালাকের দিকে যাচ্ছে। বিশেষ করে রাজধানীর গুলশান, বনানী, বারিধারা, উত্তরায় ধনাঢ্য পরিবারে সবচেয়ে বেশি বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। বাদ পড়ছে না মডেল-তারকা পরিবারও। কিন্তু সম্মান বাঁচাতে উভয় পরিবারের পক্ষ থেকে তা গোপন রাখা হয়।

মূলত শহরকেন্দ্রিক বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনাই বেশি। শহরের তুলনায় গ্রামে এই ঘটনা কম। গ্রামের মানুষ শহরের মতো এতটা প্রযুক্তিনির্ভর নয়। টেলিভিশন, ফেসবুক কিংবা ডিজে পার্টি গ্রামে নেই বললেই চলে। যৌথ পরিবারের সবাইকে নিজেদের মধ্যেই আনন্দগুলো ভাগ করে নিতে হয়। তুলনামূলক বিচারে এদের বন্ধন শহরের থেকে আলাদা। অন্যের সঙ্গে রাতে ঘুরে বেড়ানো কিংবা নিজের ব্যক্তিগত ছবি অন্যের সঙ্গে শেয়ার করার চিন্তা খুব কমই আসে। তারপরও শহরের ছোঁয়া গ্রামে লাগাতে এখন গ্রামেও বিচ্ছিন্নভাবে অনেক ঘটনাই ঘটছে। তবে সার্বিকভাবে বলতে গেলে, এভাবে আমরা যদি আমাদের বন্ধনগুলো হারিয়ে ফেলি তাহলে আমাদের মানবিক বোধেরা নিজেদের বিকলাঙ্গ ঘোষণা করে চলে যাবে মহাকালের অতল গহ্বরে। যেখান থেকে আর কোনো দিন ফেরার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। সুতরাং সময় থাকতে সাবধান হওয়াই হবে সময়ের দাবি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মা-বাবা ও সন্তানদের মধ্যকার এই ক্রমবর্ধমান দূরত্ব কমাতে এগিয়ে আসতে হবে মা-বাবাকেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বদলে সন্তানদের বেশি বেশি সময় দিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। মা-বাবার দেখাদেখি সন্তানেরাও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে আসক্ত হয়ে পড়তে পারে। এসব ক্ষেত্রে সন্তানদের আচরণে পরিবর্তন আসছে কি না, তা খেয়াল রাখতে হবে।

তথ্যসূত্র:Published: 24 Dec 2019, 14:14 (prothom alo)

সুপ্রাচীন কাল থেকে যে যৌথ পরিবারে চিত্র সারা বাংলায় দেখা যেত, এখন তা অনেকটাই ম্লান। শহুরে জীবনে অনেক আগেই বিলীন হয়েছে যৌথ পরিবারের চিত্র। বংশ মর্যাদা এমনকি ঐতিহ্যের পরিবারেও বিলীন একত্রে বাস করার ইতিহাস। পরিবার মানেই হচ্ছে মা, বাবা, ভাই, বোন, দাদা, দাদি সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে বসবাস। আমাদের সমাজব্যবস্থায় পরিবারের এই ধারণা প্রচলিত অতীত থেকেই। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে, আমরা যেন ততই এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসছি। যেন ক্রমেই 'স্বামী-

স্ত্রী-সন্তানে'ই সীমাবদ্ধ করে ফেলছি আমরা পরিবারকে। মা-বাবাকে হয়তো গ্রামের বাড়িতে কাটাতে হচ্ছে নিঃসঙ্গ-অসহায় জীবন। আবার অনেক মা-বাবার ঠিকানা হচ্ছে 'বৃদ্ধাশ্রম'। শহুরে জীবন ব্যবস্থায় এই ব্যাপারটি চরম আকার ধারণ করেছে।

সময়ের তাগিদে যৌথ পরিবার কিংবা পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার বিষয়টি যখন এই সমাজে ক্রমান্বয়ে গুরুত্বহীন হয়ে উঠছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আজকের এই আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। রক্তের বন্ধন মানেই পারিবারিক বন্ধন। পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে অকৃত্রিম সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তা অটুট রাখা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের চিরায়ত সমাজ ব্যবস্থায় সুন্দর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, সুন্দর পারিবারিক বন্ধন। পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধুর মতো হলে পারিবারিক নানা জটিল সমস্যা ও মোকাবিলা করা যায়। সকলের এগিয়ে চলার পথ হয় মসৃণ।

মানবজীবনে প্রত্যেক মানুষের জন্য পারিবারিক শিক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ। নানাবিধ চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করতে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। ভদ্রতা, নৈতিকতা, দায়িত্বশীলতা, কৃতজ্ঞতাবোধ শেখা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন, কনিষ্ঠদের স্নেহ-আদর করা, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা, পরোপকারিতার মানসিকতা গড়ে তোলা, উদার মানসিকতাবোধ জাগ্রত করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যতটা না অর্জন করা যায়, তার চেয়ে বেশি পরিবার থেকে অর্জন করা যায়।

একটি আদর্শ পরিবারে অন্যতম কার্যাবলি হলো পরিবারের সকলে মিলেমিশে একত্রে বাস করা। আর এ কাজটাই একটি আদর্শ পরিবার থাকে। পরিবারের সবাই একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা মধ্যে বাস করে। তারা বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কাজ হতে নিজেদের বিরত রাখে এবং শান্তিতে বসবাস করে। পরিবারের কারও বিপদে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাকে মানসিকভাবে সাহায্য করে। ফলে সে তার বিপদ হতে দ্রুত সেরে উঠতে পারে। একটি আদর্শ পরিবারের লোকজন সর্বদা একে অন্যের প্রতি সহযোগী মনোভাব প্রকাশ করে। কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্যের কমতে থাকে না। পরিবারের কেউ ভুল কাজ করে থাকলে তাকে শাস্তি না দিয়ে বোঝানোর মাধ্যমে ক্ষমা

করে দেওয়ার মনোভাব একটি আদর্শ পরিবার এর অন্যতম কার্যাবলি। এই আধুনিক যুগে সবাই এখন যন্ত্র হয়ে গেছে কিন্তু একটি আদর্শ পরিবার এ ক্ষেত্রে অন্যতম কার্যাবলি পরিবারের সব সদস্য একে অন্যকে যথেষ্ট পরিমাণ সময় দেয়।

পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে বলেই আমাদের সামাজিক নানা সমস্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ছে অস্থিরতা। ধর্মীয় বিধানেও রক্তের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার ওপর তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

আজকের এই আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ন থাকুক-প্রতিটি পরিবারে বিরাজ করুণ অনাবিল সুখ শান্তি।

তথ্যসূত্র:২০২৩ ,প্রথম আলো

পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করার প্রাথমিক ধাপ:

পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করার প্রথম ধাপ হল একে অন্যকে সময় দেওয়া । কে কখন কোথায় যাচ্ছে কি করছে সব কিছুর খোঁজখবর রাখা । তাই বলে এটি যেন আবার বেশি বেশি না হয়ে যায়। এরপরে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনার যে কথাটি আপনার পরিবারের লোকজন পছন্দ করে না সেই কথাটি বারবার বলবেন না ।

তথ্যসূত্র:17, 2020

https://bn.quora.com ›

পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে ইসলামের নির্দেশনা:

একটি পারিবারিক ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে পৃথিবীতে মানবজাতির যাত্রা শুরু হয়। মহান আল্লাহ পৃথিবীতে প্রথম মানব আদম (আ.) ও প্রথম মানবী হাওয়া (আ.) কে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ করে প্রেরণ করেন এবং পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটে। ইসলাম মানবজাতিকে পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

দেখে নিন পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার কিছু নির্দেশনা:

পরিবার মানুষের আশ্রয় : পরিবার-পরিজন মানুষের জন্য সর্বোত্তম আশ্রয়। পরিবার মানুষের বৈষয়িক ও মানসিক আশ্রয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আছে যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য তাতে বহু নিদর্শন আছে। ’ (সুরা রোম, আয়াত : ২১)

পারিবারিক সম্পর্কে বিপর্যয় থেকে রক্ষা : পারিবারিক সম্পর্ক অটুট থাকলে মানুষ বহু ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। কেননা তারা পরস্পরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আত্মীয়গণ আল্লাহর বিধানের একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। ’ (সুরা আনফাল, আয়াত : ৭৫)

পারিবারিক বন্ধন রক্ষায় বৈষয়িক লাভ : বর্তমান সময়ে বহু মানুষ পার্থিব লাভ-ক্ষতির বিবেচনা করে পরিবার-পরিজনকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) সম্পর্ক রক্ষাকারীর জন্য পার্থিব কল্যাণের সুসংবাদ দান করেছেন। তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি চায় তার জীবিকা প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। ’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৮৬)

ধর্মের নামেও বিচ্ছিন্নতা নয় : ইসলাম পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন অনুমোদন করে না। এমনকি আল্লাহর অধিক ইবাদতের জন্য পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার

অনুমতি নেই। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, ‘ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই। বিয়ে পরিহারের কারণে মানুষ বহু কল্যাণ ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। ’ (ফিকহুস সুন্নাহ : ৩/৩৬)

কষ্ট হলেও পরিবার থেকে দূরত্ব নয় : পারিবারিক জীবনে নানা ধরনের সংকট তৈরি হয়। ভুল বোঝাবুঝি ও মতভিন্নতা দেখা দেয়। ইসলাম এমন সমস্যাগুলো উপেক্ষা করে পারিবারিক জীবনযাপনের নির্দেশ দেয়। ইরশাদ হয়েছে, ‘তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন করবে, তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো, তবে এমন হতে পারে যে আল্লাহ যাতে কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ। ’ (সুরা নিসা, আয়াত : ১৯)

তথ্যসূত্র: আওয়ার ইসলাম

//হাইলাইট /

পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে ইসলামের ৫ নির্দেশনা

প্রকাশ: ৩০ আগস্ট, ২০২২,

পারস্পরিক সম্পর্কের লালন ও বিকাশে পারিবারিক বন্ধন:

ব্যক্তিগত জীবনে ‘সম্পর্ক’ অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব- যে সম্পর্কই আমরা বলি না তা অত্যন্ত প্রিয় এবং অনেক গুরুত্ব বহন করে। আর এই সম্পর্কগুলোকে লালন করতে হয়। সম্পর্ককে ‘নিশ্চিতভাবে’ ধরে নিলে মনের অজান্তেই হয়তো প্রয়োজন অনুযায়ী গুরুত্ব দেওয়া হয় না, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে অবহেলাও করা হয়। সময়ের সাথে সাথে, এই অবহেলা পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কের মধ্যে চাপা উত্তেজনা এবং টানাপড়েন সৃষ্টি করতে পারে।

পারিবারিক সম্পর্কের এই দূরত্ব বা অবনতি নেতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলে আমাদের মানসিক স্বাস্থের ওপর, যা জড়িত ব্যক্তিদের জন্য একদিকে যেমন মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে অন্যদিকে তেমন একাকীত্ব বাড়াতে পারে। এতে করে ভুল বোঝাবুঝি, ভুল যোগাযোগ বা অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়ে দুঃখ, অপরাধবোধ বা রাগের অনুভূতি হিসেবে প্রকাশ হতে পারে। ফলশ্রুতিতে, এক সময় সম্পর্কের মিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়- অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তা বুঝতেই পারি না। আর এই সম্পর্ক একবারে বা একদিনে নষ্ট হয় না, এটা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়- এমনকি বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই, যা পরবর্তীতে বিশ্বাস এবং ঘনিষ্ঠতা পুনঃনির্মাণকে দুর্বোধ্য করে তোলে।

আমরা জানি, পরিবারকে সামাজিকীকরণ এবং সমাজের একটি মৌলিক একক হিসেবে দেখা হয়- যা আমাদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মানসিক সমর্থন দিয়ে থাকে। থোমাস এবং অন্যদের (২০১৭) মতে সুস্থ জীবন পরিক্রমায় পারিবারিক সম্পর্কের এক দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে।

পারিবারিক সম্পর্কগুলো বিভিন্ন ধরনের- যেমন : রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক, দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সম্পর্ক বা সংযোগ বা বন্ধন। এই সম্পর্কগুলো মানবসমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যা পারিবারিক ও সামাজিক জটিলতা এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে বা হতে থাকে। স্পর্শকাতর/গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে লেখাটিতে প্রধানত- ৩টি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে– প্রথমত, সম্পর্কগুলো কী অপরিবর্তনীয় না কি পরিবর্তন হয়, দ্বিতীয়ত, পরিবর্তন হলে কেন হয় এবং তৃতীয়ত, সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী।

প্রথমে আসা যাক পারিবারিক সম্পর্কের পরিবর্তনের বিষয়ে। পারিবারিক সম্পর্ক অপরিহার্যভাবে স্থির নয়; তা বিভিন্ন কারণ এবং পরিস্থিতির কারণে অর্থাৎ প্রতিটি সদস্যের ওপর অর্পিত দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপকভাবে সময়ের সাথে পরিবর্তিত এবং বিকশিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, দৃষ্টি ফেরানো যাক এই পারিবারিক পরিবর্তন বা বিবর্তন কেন হয় তার দিকে। পারিবারিক সম্পর্ক বিভিন্ন কারণে পরিবর্তন হতে পারে এবং এই কারণগুলো এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে ব্যাপকভাবে আলাদাও হতে পারে। পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি একটি জটিল এবং বহুমুখী প্রক্রিয়া, প্রায়ই কারণগুলো একে অন্যের সাথে জড়িত। বিভিন্ন কারণে এই সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে, কিছু স্বাভাবিক কারণের প্রথমটিই হলো নিত্যদিনের ব্যস্ততা। ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিদিনের বহুবিধ ব্যস্ততার কারণে আমরা অতি আপনজন থেকে শুরু করে অনেক কাছের মানুষকেও ঠিকমতো সময় দিতে পারি না বা যোগাযোগ বজায় রাখতে পারি না। ফলে, ধীরে ধীরে আমাদের অজান্তেই এই সুন্দর সম্পর্ক থেকে বা একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। পরিবারের সদস্যদের দ্বারা মানসিকভাবে অবহেলা বা পরিত্যাগ গভীর মানসিক ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে এবং পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে। এ ছাড়াও রয়েছে ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিসরের বা স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা থেকে সৃষ্টি হওয়া একা থাকার মানসিকতা।

এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে একা থাকার মানসিকতা গড়ে উঠেছে যা হয়তো ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট উৎকণ্ঠার বিষয়। এই একা থাকার মানসিকতার কারণে তারা পরিবারের মানুষকে সময় দিতে চাই না, আত্মীয়স্বজনকে সময় দিতে বিরক্ত বোধ করে, এমনকি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সম্পর্ক থাকলেও তা যথেষ্ট ঋদ্ধতার হয় না। তৃতীয়ত, উল্লেখ করা যেতে পারে সংসারে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা রাখার আগ্রহ– যা প্রকাশিত হয় একক (নিউক্লিয়ার) পরিবারের প্রতি পক্ষপাতে। স্বামী-স্ত্রী ও শুধু নিজের সন্তান নিয়ে থাকার মানসিকতাও একটা অনেক বড় অবদান রাখে এই সম্পর্কের অবক্ষয়ের পেছনে তা আমাদের অজানা নয়।

ভার্চুয়াল ভাইরাস বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতি আসক্তি যা মুঠোফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকেই উদ্ভূত হয়, তা একটা বড় ভূমিকা পালন করে সম্পর্কের রূপরেখা পরিবর্তনে। মুঠোফোনের ব্যবহার আমাদের যোগাযোগ অনেক সহজ করে দিয়েছে সত্যি, কিন্তু এর বহুবিধ ও অতিমাত্রিক ব্যবহার আমাদের অনেক ব্যস্ত করে

দিয়েছে। সহজ এই যোগাযোগের মাধ্যম আমাদের সম্পর্কের উন্নতি না করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবনতি করছে তার বিভিন্ন App-এর অতিমাত্রায় ব্যবহারের কারণে। চারপাশে তাকালে দেখা যায়, একই টেবিলে, একই জায়গায় বা একই ঘরের মধ্যে থেকেও প্রত্যেকে মুঠোফোন নিয়ে ব্যস্ত।

পরমত অসহিষ্ণুতা অর্থাৎ ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব এবং মতবিরোধ এরজন্য অনেকটাই দায়ী। মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অগ্রাধিকার এবং ব্যক্তিত্বের পার্থক্য একটি পরিবারের মধ্যে মতবিরোধ এবং দ্বন্দ্বের দিকে নিয়ে যা পরবর্তীতে সম্পর্কের টানাপড়েন ঘটাতে ভূমিকা রাখে। কমিউনিকেশন গ্যাপ বা খোলা আলোচনার অভাবও পারিবারিক সম্পর্কে দেয়াল তুলে দেয়। মন খুলে কথা বলার অভাবে পরিবারের সদস্যরা তাদের ক্ষোভ, অতীতের আঘাত বা অমীমাংসিত সমস্যাগুলো ধরে রাখতে পারে যা সময়ের সাথে সাথে তাদের সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়।

'Sibling rivalry' বা সহোদরদের মধ্যে ঈর্ষা এবং প্রতিযোগিতা আরেকটি সাধারণ অথচ দুঃখজনক কারণ। ভাইবোনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ঈর্ষা সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে পারে, বিশেষ করে ভাইবোনের মধ্যে যখন তারা অনুভব করে, তারা পিতামাতার মনোযোগ বা তাদের সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় রয়েছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সদস্য পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের মধ্যে এক একজনের ভূমিকা এবং তাদের প্রত্যাশাগুলো পরিবর্তন হতে পারে, যা অনেক সময় বিভ্রান্তি এবং অস্বস্তির কারণ হতে পারে।

এবার আসি সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে আমাদের করণীয় কী সে বিষয়ক আলোচনায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি সন্তানের শিক্ষায়, শৈশবে অভ্যন্তরীণ ব্যাধি এবং মানসিক স্বাস্থ্যে (হতাশা, উদ্বেগ ইত্যাদি) প্রভাব ফেলে (Brock & Kochanska, 2015; Steele et al., 2009; Mphaphuli, 2023)। প্রতিটি পরিবার অনন্য এবং পারিবারিক গতিশীলতার প্রকৃতি এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। এজন্য, পারিবারিক সম্পর্কের এই পরিবর্তনের মুখে সুস্থ, সুন্দর ও ইতিবাচক পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য খোলামেলা যোগাযোগ,

সহানুভূতি এবং একে অপরকে বোঝার এবং সমর্থন করার ইচ্ছা অপরিহার্য। যদিও নষ্ট বা অবনীত পারিবারিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা একটি চ্যালেঞ্জিং/কঠিন ব্যাপার, তবে অসম্ভব নয়। এটি একটি ধীর এবং চলমান প্রক্রিয়া।

পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃনির্মাণে সময় লাগতে পারে এবং পথে বাধা হতে পারে। তবে, ধৈর্য ধরে চেষ্টা করতে হবে। হয়তো অবিলম্বে ফলাফল আশা করা যাবে না, তবে ধীরে ধীরে সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব। সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে পারলে এর ভালো দিক বা সুবিধাই বেশি।

পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃনির্মাণ এবং উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে এমন কিছু পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে – প্রথমত, খোলামেলা এবং সৎ যোগাযোগ। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কী বলার আছে তা সক্রিয়ভাবে শুনতে হবে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুভূতি বোঝার চেষ্টা চেষ্টা করতে হবে। পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে খোলামেলা এবং সম্মানজনক যোগাযোগকে উৎসাহিত করতে হবে। সততার সাথে চিন্তাভাবনা এবং আবেগ ভাগ করে নেওয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, ক্ষমা চাওয়া এবং ক্ষমা করা। সম্পর্কের অবনতিতে যে অবদান রাখে তাকে তার কার্যকলাপের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে এবং প্রয়োজনে আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ক্ষমাকে সমস্যা সমাধানের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে চিন্তা করে পরিবারের সদস্যদের তাদের অতীতের ভুলের জন্য ক্ষমা করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে এবং ক্ষোভ ছেড়ে দিতে হবে।

তৃতীয়ত, একসঙ্গে গুণগত/মানসম্পন্ন সময় কাটানো। পরিবারের সদস্যদের সময় দিতে হবে এবং তাদের সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটাতে হবে– যা পারিবারিক বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করতে পারে। পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান, দেশীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যগুলো আলোচলা করতে হবে, উপভোগ করতে হবে- যা পরে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি তৈরি করতে পারে। পারিবারিক সম্পর্কের ছোটখাটো উন্নতিকে উপভোগ এবং উদযাপন করতে হবে।

চতুর্থত, সহানুভূতি এবং বোঝাপড়া। পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে একে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি এবং চাহিদা বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং এই অনুযায়ী সহানুভূতি অনুশীলন করতে হবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সম্পর্ক থেকে সরে আসতে হবে। পঞ্চমত, দোষ এবং বিচার এড়িয়ে চলা। দোষারোপ না করে সমাধান খোঁজার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। বিচারমূলক ভাষা এবং সমালোচনা এড়িয়ে চলা পুনর্মিলনের জন্য আরও ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাস এবং জীবনধারাই ভিন্নতা থাকতে পারে- বিচার ছাড়াই এই পার্থক্যগুলো গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

এবং সর্বোপরি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নিয়মিত আত্ম-বিশ্লেষণ। নিজের আচরণ, মনোভাব এবং ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তা কীভাবে সম্পর্কের অবনতিতে অবদান রাখছে বা রাখতে পারে তা চিহ্নিত করে সংশোধন করতে হবে। শান্ত থাকা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল রপ্ত করতে হবে।

প্রতিদিনের পত্রিকা পড়লে আর চারপাশে খেয়াল করলেই দেখা যায়, দিনে দিনে আমাদের দেশে পারিবারিক সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি হচ্ছে। যত্ন, বোঝাপড়া এবং ভালোবাসার সাথে এই পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে লালন করতে করতে হবে, এটাকে 'নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া (taken for granted)' যাবে না। এটি একজনের পক্ষে সম্ভব নয়, পরিবারের প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য একটি সহায়ক এবং পরিপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায়, যথাযথ লালনের অভাবে এই সুন্দর পারিবারিক সম্পর্ক হয়তো আমরা হারিয়ে ফেলব।

তথ্যসূত্র: ড. জিন্নাত আরা : রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক বন্ধন, পারিবারিক বন্ধন দৃরভাবে গঠনের কৌশল:

মানব জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই জগতে কোন না কোনভাবে পারিবারিক ব্যবস্থা চালু ছিল। পৃথিবীর প্রথম পরিবার গড়ে ওঠে হযরত আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়ার মাধ্যমে। পরিবারের সদস্য প্রথমত তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজন ছিলেন। সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ এ পরিবারকে জান্নাতে বসবাস করতে দেন। আল্লাহ পাক সূরা বাকারার ৩৫ নং আয়াতে বলেন : 'হে আদম! তুমি আর তোমার স্ত্রী দুজনে জান্নাতে বসবাস কর।' পরবর্তীকালে তাঁরা পৃথিবীতে আগমন করলেন এবং তাঁদের থেকে জন্ম নেয় তাঁদের সন্তান-সন্ততি। এভাবে পৃথিবীতে পরিবার ও পারিবারিক ব্যবস্থার সূচনা হয়।

অতীতের সব নবী ও রাসূলের জীবনে ও সময়কালে পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পরিবারের জন্য দোয়া করেছিলেন। সূরা বাকারার ১২৮ নং আয়াতে এসেছে : 'হে পরওয়ারদিগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ করো এবং আমাদের বংশধরদের থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি করো। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।'

নিঃসন্দেহে, পরিবার হচ্ছে মানুষের বেড়ে ওঠার অন্যতম কেন্দ্র। মানুষের উন্নতি কিংবা তার অধঃপতন পরিবারের সুস্থতা ও পরিশুদ্ধতার ওপর নির্ভরশীল। আর সমাজের সুস্থতার জন্য পরিবারের বিকল্প নেই। কোরআনে সূরা নাহলের ৭২ নং আয়াতে এসেছে : 'তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতীয় জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন আর তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের দান করেছেন পুত্র ও পৌত্র।' কোরআন মজীদে 'বাইত' শব্দটি পরিবার অর্থে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনের এ আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, মানবতার ধর্ম ইসলাম পরিবার ও পারিবারিক জীবনের ওপর যথেষ্ট তাগিদ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে পরিবারের

অপরিহার্যতার দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

এখন আমরা পবিত্র কোরআনে পরিবারের গুরুত্ব নিয়ে খানিকটা আলোচনা করব। প্রশান্তির স্থান : পরিবার তথা গৃহের অন্যতম কাজ হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করা। পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডি ও নিরাপদ আলয়ে মানুষ তার আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে এবং তার সহজাত কামনা-বাসনা এবং দৈহিক ও আত্মিক চাহিদাগুলোর নির্বৃত্তি করতে সক্ষম হয়। মহান স্রষ্টা নিজেকে এই প্রশান্তি ও নিরাপত্তার উৎস হিসেবে উল্লেখ করে বলেন :

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

অর্থাৎ 'আল্লাহ করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা'। (সূরা নাহল : ৮০)

আরবি 'সাকানা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে যার মাধ্যমে মানুষ প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে। (১) মানুষ গৃহে তার শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজন মেটাবার পাশাপাশি আত্মিক ও মানসিক উপশমের জন্য সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডি এড়িয়ে একান্তে নিজ আলয়ে বিশ্রাম এবং নিজ স্রষ্টার সাথে ভাব বিনিময় তথা প্রার্থনার প্রয়োজন অনুভব করে। পরিবার যদি তার এ চাহিদা মেটাতে না পারে তাহলে তা শান্তির নীড় হতে পারে না। স্রষ্টার স্মরণ ও যিকিরের স্থান : সূরা আহযাবের ৩৪ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

অর্থ : আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে।

এ আয়াতটি নবী করিম (সা.)-এর স্ত্রীদের প্রতি সম্বোধন করে নাযিল করা হয়েছে। এ আয়াতে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে :

প্রথমত, গৃহ বা পরিবার থেকে মানুষ যে মূল্যবোধ অর্জন করে তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং একে পুরো জীবনের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবার হচ্ছে বিশ্বের সব পরিবারের জন্য উত্তম আদর্শ। কাজেই আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তৃতীয়ত, গৃহের নিবিড় ও শান্ত পরিবেশ যদি স্রষ্টার আনুগত্য ও তাঁর স্মরণের স্থানে পরিণত হয় তখন স্রষ্টা নিজেই সেই গৃহের মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেন। সূরা নূরের ৩৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন :

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

অর্থ : আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

আল্লামা তাবাতাবায়ী তাঁর 'তাফসীরে আল মীযান' গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, যে আবাস পাক-পবিত্র ও নিষ্কলুষ সেটি স্রষ্টার ইবাদত ও স্মরণের স্থানে পরিণত হবে। তখন তা আর নি®প্রাণ চার দেয়ালের সাধারণ গৃহ থাকবে না; বরং ঐশী রং এ রঙিন হয়ে আধ্যাত্মিক এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে। এর ঐশী দিক যতটা জোরালো ও গাঢ় হবে গৃহের মর্যাদা ততই বাড়বে।

'বায়তুল্লাহ' বা কাবা ঘর হচ্ছে এর বাস্তব নিদর্শন।(১)

ঐশী বন্ধনের স্থান : সূরা নূরের ৬১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন :

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُ طَ وا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

অর্থ : অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া। এ আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে 'সালাম' ও শুভ কামনার মাধ্যমে এবং আল্লাহর স্মরণ ও খোদাভীতি তাদের মধ্যে থাকতে হবে। পরিবারে এ ধরনের পবিত্র আবহ বিরাজ করলে নিঃসন্দেহে তা সমাজেও ছড়িয়ে পড়বে। কাজেই সালামের তাৎপর্য হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, আস্থা ও ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়া।

গৃহের মান ও সম্ভ্রম রক্ষা : পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ পরিবারের মর্যাদার ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন। আর তাই এ ঐশী গ্রন্থের একাধিক আয়াতে পরিবার সুরক্ষার নানা দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূরা নূরের ২৭ নং আয়াতে রয়েছে : أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর।

এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।' এ আয়াতে আল্লাহ পাক অনুমতি ও সালাম ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ নিষিধ করেছেন এবং পরিবারের মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এ ধরনের বিধি-নিষেধ মেনে চলাকে জরুরি বলে উল্লেখ করেছেন।

'সালাম' শব্দটির মধ্যে রয়েছে পরিবারের সদস্যদের প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা এবং তাদের প্রতি আন্তরিকতা ও শান্তির ঘোষণা দেয়া।

আদী ইবনে সেবাত থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার আনসার গোত্রের এক মহিলা রাসূলে খোদা (সা.)-এর নিকট আগমন করে বলেন, 'আমি নিজ গৃহে অনেক সময় একান্তে থাকতে চাই এবং পরিবারের অপরাপর সদস্যদের কেউ-আমার পিতা, সন্তান কিংবা অন্য কোন পুরুষ আত্মীয়-যদি গৃহে প্রবেশ করেন, তখন কী করব?' মহিলার এ প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতের আলোকে বলা যায়, অপরের গৃহে

প্রবেশের ক্ষেত্রে গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া গৃহের ভেতরে প্রবেশ করা যাবে না। এ ছাড়া সূরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতে নবী করিম (সা.)-এর গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রেও অনুমতি নেবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
কোরআনের দৃষ্টিতে পরিবারের সংজ্ঞা : পবিত্র কোরআনের আলোকে 'পরিবার' হচ্ছে এমন একটি সংগঠন যার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এর সদস্যদের, যেমন : স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানদের আত্মিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা এবং তাদেরকে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করা।
সূরা ফোরকানের ৭৪ নং আয়াতে এসেছে :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থ : এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।
এ আয়াতে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য পরিবারের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি একটি সুস্থ ও আদর্শ পারিবারিক আবহ যে ঈমানদারদের পরম কাঙ্ক্ষিত তা উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি আদর্শ পরিবারের ভিত্তি গৃহের সদস্যদের মধ্যকার আন্তরিক ও নিবিড় সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। পরস্পরের প্রতি দায়িত্বানুভূতি পরিবারের বন্ধনকে দৃঢ় ও অটুট রাখে। পরিবারের সদস্যরা যদি স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে নিজেদের মধ্যকার বন্ধনকে ধরে রাখতে পারে তবে মানবীয় উৎকর্ষতা ও পূর্ণতা অর্জন সহজতর হয়।

সূরা রূমের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُون

অর্থ : এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আর এক নিদর্শন (হচ্ছে) : তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট

শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন; নিশ্চয় চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন আছে।
এ আয়াতের লক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে :

প্রথমত, (مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) 'তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন' পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, গৃহে পরিবারের সদস্যদের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। প্রত্যেকের চরিত্রের ভালো ও মন্দ দিক, চারিত্রিক গুণ বা দুর্বলতা সবই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ফলে পরিবারই হচ্ছে নিজেকে গড়ার তথা সংশোধনের অন্যতম পীঠস্থান। সন্তানের প্রতি মা-বাবার স্নেহ, দয়া-মমতা এবং মা-বাবার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, আস্থা-বিশ্বাস ও ত্যাগের মাধ্যমে প্রত্যেকেই নিজেদের চারিত্রিক ত্রুটিগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের বাহ্যিক পরিশীলতার চেয়ে আত্মিক শুদ্ধতা ও পবিত্রতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর গৃহের আন্তরিক ও নিবিড় পরিবেশে ভালোবাসা ও মমতার ছোঁয়ায় মানুষের আত্মগঠন ও সংশোধনের প্রক্রিয়া সহজ হয়ে ওঠে।
দ্বিতীয়ত, (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً) 'তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন' মহান আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা মানুষের চিরন্তন প্রকৃতিজাত করে দিয়েছেন।
এসব গুণ ও অনুভূতির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী আত্মিক পরিশুদ্ধতার পাশাপাশি নিজ স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে অপার সুখ ও প্রশান্তি অর্জন করতে পারে।
তৃতীয়ত, (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) 'যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও' প্রশান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন পারিবারিক জীবনের অপর একটি অন্যতম লক্ষ্য। পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী এবং পরবর্তীকালে সন্তানদের দায়িত্ব হচ্ছে এ লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়া।

চতুর্থত, (وَرَحْمَةً) 'তিনি তোমাদের মধ্যে রহমত ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন' স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, মায়া, মমতা ও সহানুভূতি পরিবারে শান্তি ও

নিরাপত্তার অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে পারে। শান্তিপূর্ণ ও সুস্থ পারিবারিক আবহে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে তৈরি হয় ভালোবাসা ও হৃদ্যতা।এ ধরনের পরিবেশে প্রতিপালিত ও বেড়ে ওঠা সন্তানরাই একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজের ভিত্তি নির্মাণ করতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার হলো একটি শিশুর জীবন গড়ার প্রাথমিক পাঠশালা ও প্রধান পাঠাগার। এ পাঠশালার ওপর শিশুর জীবনের ভিত রচিত হয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসবাসের মধ্য দিয়েই শিশুরা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার গুণাগুণের পরিচয় লাভ করতে শুরু করে। এ জন্য পরিবারের প্রধান দুজন সদস্য বাবা-মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। মাতা-পিতার কারণে শিশু পৃথিবীর মুখ দেখতে পেরেছে। মমতাময়ী মায়ের কারণেই সন্তানের পৃথিবীর আলো দেখার সৌভাগ্য হয় এবং নিরাপদে বেড়ে ওঠে। সন্তান গর্ভে ধারণ, প্রসববেদনার কষ্ট এবং দুধপান করানো প্রভৃতি মা একাই বহন করে থাকেন। এরপর বাবা লালন-পালনের কাজে মায়ের সঙ্গে অংশীদার হয়ে থাকেন। এর বাহ্যিক প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ তাআলা সন্তানের প্রতি তার মাতা-পিতার সঙ্গে সদয় ও সদ্ব্যবহারকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং ইবাদত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

সূরা বনী ইসরাইলের ২৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অর্থ তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন : তোমরা তাঁর ইবাদত ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত কর না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনো একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে ‘উহ্’ পর্যন্তও বল না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মান ও মর্যাদার সাথে কথা বল। পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানদের লালন-পালন করা, তাদের

সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা। রাসূলে খোদা (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী, সন্তান হচ্ছে পিতা-মাতার কাছে আল্লার আমানতস্বরূপ। তাই তাদেরকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি অবশ্যই নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দিতে হবে। নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হয় তখন তাদের নামাজের প্রশিক্ষণ দাও।' অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে : 'সুন্দর নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে উত্তম আর কিছুই পিতা-মাতা সন্তানদের দান করতে পারে না।' বিশ্বনবী(সা.) পারিবারিক জীবনের সুস্থতার ওপরে ভীষণ গুরুত্ব প্রদান করেছেন, যা আমাদের অনুসরণযোগ্য। হাদিসে এসেছে যে, রাসূলে খোদা (সা.) একবার তাঁর মেয়ে ফাতেমা (সা. আ.), তাঁর স্বামী হযরত আলী ও হাসান-হোসাইনকে এক চাদরের নিচে রেখে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন : 'হে আল্লাহ! এরা হচ্ছে আমার আহলে বাইত (পরিবার)।'

পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ মর্যাদায় উচ্চ স্তরে পৌঁছে। অপর একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'মুমিনের মধ্যে ঐ ব্যক্তির ঈমান সবচেয়ে পরিপূর্ণ, যে চরিত্রের সৌন্দর্যে উন্নত এবং নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি সর্বাপেক্ষা সদয় ও নম্র ব্যবহার করে।'

স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, ভাই-বোন প্রভৃতি নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। তাই সুস্থ পরিবার গঠনে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, জীবনের অন্য সকল দিকের মতো পরিবার ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও ইসলামের রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। একটি পুরুষ ও নারী কিভাবে দাম্পত্য জীবন শুরু করবে, তাদের একের প্রতি অন্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও বিসম্বাদ দেখা দিলে কীভাবে তার সমাধান করবে সব বিষয়েই ইসলাম দিয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, ইসলামের সেসব নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ার আজ বিশ্বের মুসলিম সমাজ ভুগছে নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে।আমাদের প্রাণের ধর্ম ইসলাম শান্তিময় জীবন ও পারস্পরিক

সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য শেখানোর জন্য দিয়েছে ‘পরিবার ব্যবস্থা’। কোরআনের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করলেই কেবল আদর্শ পরিবার গঠন করা সম্ভব। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর নির্দেশিত পথে আমাদের পরিবারগুলো গঠন করার তওফিক দিন।

তথ্যসূত্র:

iran mirrors শাহনাজ আরফি(লেখকও গবেষক)

সারসংক্ষেপ :

و ا مر اهلك با لصاو ت واصطب عليها

অর্থ নিজের পরিবার বর্গকে নামাজের হুকুম দাও এবং নিজেও এর পাবন্দি করো ।

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের দিকে ফিরে এসো স্পষ্ট হুকুমসমূহ এবং আম্বিয়া আলাই সালাম এর সুন্নতে জারিয়া অব্যাহত নিয়ম এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে একজন মুসলমানের দায়িত্ব শুধুমাত্র নিজের দ্বীন ইসলাম সেই নয় বড় নিজ সন্তান পরিবারের তিনি শিক্ষা দান ও তার দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত ।

তাছাড়া নিঃসন্তান ও পরিবারের তিনি ইসলাম অর্থাৎ সংশোধন ব্যতীত নিজেও দিনের ওপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা ওটিতে থাকা সম্ভব নয় যদি কোন ব্যক্তির পরিবারের সকল সদস্যই দিন ধর্ম বিমুখ এবং খোদা হয় হারা হয় তাহলে সে ব্যক্তি নিজের যত বড়ই দ্বীনদার হোক হোক না কেন সে একদিন না একদিন এ দুই দিন পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবিত হবেই কাজেই নিজেকে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর রাখার জন্য হলেও একথা অত্যন্ত জরুরী যে নিজ পরিবার পরিজন ও আশেপাশের লোকদেরকে নিজের আদর্শের ধর্ম অনুযায়ী ও সহযোগিতা বানানোর জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো।

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111371306/